শরীরটার ভার সাম্‌লাইতে না পারিয়া, সে সবেগে ঘুরিয়া আসিয়া 'লাইট-পোষ্টে'র তলায় আছাড় খাইবার যো করিল।

হঠাৎ পিছনের অন্ধকার গলির ভিতর হইতে আর একজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নমিতার পার্শ্বে পৌঁছিল। নমিতার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া, ক্ষিপ্র সতর্কতায় দুইহাতে পতনোন্মুখ লোকটাকে ধরিয়া ফেলিল। সবেগে এক ঝাঁকুনী দিয়া তাহাকে সোজা করিয়া, রুদ্ধস্বরে বলিল "আপ্‌নে ডেরা পর্ চলা যাও ভাই!—"

দলের প্রকৃতিস্থ দুইজন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রতিভ-ভাবে সবিনয়ে ক্ষমা চাহিয়া উপর্য্যুপরি সেলাম ঠুকিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় হড়্ বড়্ করিয়া নানা কথা সে বকিয়া গেল। তাহার মধ্যে একটি কথা নমিতা শুধু বুঝিল,—"আপ্‌কো মঙ্গল হোক্, হামি লোক্ তো আপ্‌কো.....।"

পরস্পরকে ধাক্কা মারিয়া, ঠেলিয়া, টানিয়া লইয়া, খুব ব্যস্তভাবে তাহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সাহায্য-কর্ত্তাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবার জন্য ফিরিয়া, তাহার পানে চাহিয়া নমিতা বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল! এ যে—সেই, সুরসুন্দর!

সুরসুন্দরও বিস্ময়বিমূঢ়-ভাবে নমিতার পানে চাহিয়া রহিল। প্রথমতঃ সে কথা কহিতে পারিল না; তারপর মৃদু ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "আপ্‌নি! ছি ছি, বড় ছেলেমানুষী করেছেন ত! এমন সময় একলাটি রাস্তায়...! কাজটা ভাল হয় নি।... আমি ভেবেছিলাম, আর কেউ!"

নমিতার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। অতি-কষ্টে, আরক্ত মুখে সে বলিল, "বুঝ্‌তে পারি নি। ভাগ্যিশ, আপনি..., কি উপকার যে কর্‌লেন! আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার ভাষা..."

বাধা দিয়া শুষ্ক ম্লান-মুখে সুরসুন্দর বলিল, "দয়া করে ও-সব বিড়ম্বনা-ভোগের দায় থেকে নিষ্কৃতি দেন! একটু দাঁড়ান, আস্‌ছি।"

সুরসুন্দর দ্রুতপদে পার্শ্বের অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকিল; ক্ষণপরে একজন জীর্ণ-শীর্ণ কুব্জদেহ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া, সাবধানে তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল। নমিতা অবাক্ হইয়া দেখিল, বৃদ্ধটি তাহাদের হাঁস্‌পাতালের মেথর 'রমণার' বৃদ্ধ পিতা —'জীবলাল মেথর'।

নিকটে আসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "আপ্‌নি আগে চলুন—।" নমিতা বিনা-বাক্যে চলিতে লাগিল। সুরসুন্দর মৃদু-স্বরে বলিল, "স্মিথের কুঠিতে খোঁজ নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি; স্মিথ্ বলে দিলেন, কাল সকালেই একখানা ধরপাতে সই করে ক্লার্কের কাছে পাঠাবেন, সাহেব সাতদিন ছুটি দিতে রাজি হয়েছেন।...আর সমুদ্রপ্রসাদ কাল সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে আপনার হাতটা ধুয়ে দিয়ে আস্‌বে, বলে দিয়েছি।"

নমিতা বলিল, "ধন্যবাদ! আমার 'ডিউটী'টা কার হাতে পড়্‌ল, জানেন?"

সুরসুন্দর বৃদ্ধের হাত ধরিয়া একটা উচু নালী পার করাইতে করাইতে বলিল, "আমার; সঙ্গে ছোট কম্পাউণ্ডার দেবীশঙ্কর থাক্‌বে।"

ইতস্ততঃ করিয়া নমিতা বলিল, "ডাক্তার

মিত্র কিছু বলেন নি ত? আপনি দেরী করে যাওয়ার জন্যে?"

ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "ডাক্তার-সাহেবকে কে কি বলেছেন বুঝি! সাহেব কি বলেছেন, জানি না। ওরা ত বলাবলি করছিল। স্মিথ্ শুনে চটে গেছেন,... তাই আপনাকে তাড়াতাড়ি 'এ্যাপ্লিকেশনের' কথা বলতে পাঠালেন।... যাক্, ও-সব বাজে কথা শোনবার জন্যে কান পেতে বসে থাকলে ত কোনই কাজ করবার সময় পাওয়া যাবে না। শীঘ্র চলুন।"

নমিতা শীঘ্র চলিতে লাগিল। বলিবার মত কোন কথা সে হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইল না; অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ডাক্তারবাবুর কি চমৎকার স্বভাব!

কিন্তু থাক্, সে-সকল আলোচনা লইয়া আর চিত্তগ্লানির উদ্বর্ত্তনে কাজ নাই। পরের দোষ-ত্রুটির চর্চ্চায় ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তিকে খাটাইলে, শেষে হয়ত সাঙ্ঘাতিক চক্ষু:-পীড়া আবির্ভূত হইবে।...অতএব এ-সকল বিষয়ে খানিকটা পাশ কাটাইয়া চোখ্-কাণ বুজিয়া থাকাই ভাল। নমিতা মনটাকে ধমক দিয়া শান্ত-নিরীহ বানাইয়া লইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

উঁচু নীচু অসমতল পথে চলিতে ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ জীবলাল ক্রমাগতই ঠোক্কর খাইতেছিল। সুরসুন্দর সতর্ক হইয়া তাহাকে সাম্লাইয়া লইতেছিল। এইবার তাড়াতাড়ি চলার জন্য বৃদ্ধ অসাবধানে একটা বড় রকম হোঁচট্ খাইয়া টলিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে সুরসুন্দর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুক পাতিয়া নিঃশব্দে তাহার বার্দ্ধক্য-জীর্ণ অসমর্থ দেহের ভারটা সাম্লাইয়া লইল। তাহার কাঁধের উপর বৃদ্ধের মুখ থুবড়াইয়া গেল। সুরসুন্দর তাহাকে সোজা করিয়া, তাড়াতাড়ি দাড়িতে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "বড়া লাগল ভৈ?"

"নেই বাপ্, কুছ নেই!—"এই বলিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ আঘাত-বেদনাটা অস্বীকার করিয়া প্রীতি-কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল বদনে বলিল, "জীতা রও বাপ্, আজ তোম্কো নেহি মিল্নেসে হাম্ তো রাত্তে পর মর্ যাতা—।"

সুরসুন্দর সে কথায় কান দিল না; মাথা হেঁট করিয়া ঘাড় বাড়াইয়া দিয়া বলিল, পাকড়ো হাম্রা কান্ধা।—হাঁ চলো।... মিস্ মিত্র, একটু আস্তে—।"

নমিতা নীরবে মুখ ফিরাইয়া একবার মুগ্ধ-করুণ দৃষ্টিতে উভয়ের অবস্থাটা দেখিয়া লইল; তারপর আবার পূর্ব্বের মত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

সম্মুখ হইতে আর একদল লোক আসিল। নির্ভয়ে ক্রীড়ারত কপোত-শিশু অকস্মাৎ সম্মুখে উদ্যত-নখর বাজপাখী দেখিলে যেমন সভয়ে চমকিয়া উঠে,—কে জানে কেন, অন্যমনস্ক নমিতাও আজ হঠাৎ দস্তদায়ার মুখপানে চাহিয়া, অন্তর-মধ্যে তেমনিতর একটা তীব্র-চমক খাইল! কি কুহিবে ভাবিয়া পাইল না, তাড়াতাড়ি আঁচলটা টানিয়া ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতখানার উপর ঢাকা দিল।

সাচ্চা জরির 'বাদ্লা' বসান, লেসের বিপুল আড়ম্বরশ্রী-যুক্ত, মূল্যবান্ জ্যাকেট ও সাড়ির খস্খসে শব্দের সহিত জুতার খট্খট্

শব্দ মিশাইয়া, স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষগম্ভীর কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মিহি-কোমল করিয়া, হাসি-হাসি-মুখে গল্প করিতে করিতে দত্তজায়া আসিতেছিলেন। সঙ্গে ডাক্তার মিত্রের 'মনের মত' পরিহাস-রসিক বন্ধু, স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকীলের কীর্ত্তিমান্ বংশধর 'নিরেট বখা'-নামে বিখ্যাত 'হিতলালবাবু', সৌখীন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিতেছিলেন। দত্তজায়ার ভৃত্য আলো হাতে লইয়া আগে আগে আসিতেছিল।

পিছনে আর তিনজন পথিক তাঁহাদের আলোয় পথ দেখিয়া আসিতেছিল। তাহাদের একজন বৃদ্ধ, একজন যুবা ও অপরটি কিশোর বালক। বৃদ্ধটি বিরক্তি-কুটিল দৃষ্টিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়াকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। যুবাটি সহুরে ফাজিল;—সে বিদ্রূপবর্ষী হাসি-মাখা মুখে ও বক্র কটাক্ষে একবার হিতলাল-বাবুকে ও একবার দত্তজায়াকে দেখিতেছিল, আর ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গীর সহিত নানা ছাঁদে কাশিতে কাশিতে হাসিতেছিল। বালকটি নির্ব্বোধ; সে কৌতূহল-বিস্ফারিত নয়নে তাহাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া চলিতে চলিতে বারংবার হোঁচট খাইতেছিল।

চকিতদৃষ্টিতে পিছনের লোক-তিনটির পানে চাহিয়া নমিতার আভ্যন্তরিক সঙ্কোচ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল! ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে একবার দত্তজায়ার পানে চাহিয়া সে মাথা হেঁট করিয়া, কুণ্ঠিতভাবে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুরসুন্দর চোখ তুলিয়া একবার তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া লইল। বন্ধুপ্রীতির অনুরোধে হিতলালবাবু প্রায়শঃ হাঁসপাতালে ডাক্তারদের বসিবার ঘরে আসিয়া আড্ডা দেন। সুতরাং, হাঁসপাতালের সকলেই তাঁহাকে চেনে। সুরসুন্দর তাঁহাকে একটা ছোট নমস্কার করিয়া চোখ নামাইল। তারপর বৃদ্ধ মেথরের পায়ের নীচেকার পথটা সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ করিতে সে সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র গোল গোল চোখের তীব্র প্রখর দৃষ্টি হানিয়া দত্তজায়া একবার সুরসুন্দরকে ও একবার নমিতাকে দেখিয়া লইয়া কর্ত্তৃত্ব-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব?"

নমিতা কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, দত্তজায়ার ভৃত্যটি হাতের লণ্ঠনটা বৃদ্ধ মেথরের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, অকুণ্ঠিত স্পর্দ্ধায় উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "বা বা, কম্পাউণ্ডার-সাহেব, 'ভঙ্গিকো' হাঁথ পাকড়'কে আপ্ কৌন 'স্বরগো'মে লে যাতা?"

কোন্ স্বর্গে লইয়া যাইতেছে, তাহার নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় সুরসুন্দর চুপ করিয়া রহিল। বৃদ্ধ মেথর লজ্জায় 'এত-টুকু' হইয়া কুণ্ঠিতহাস্যে বলিল, তাহার পুত্র রমণার আজ 'জান্ খারাব' হইয়াছে, তাই সে তাহার 'উর্দ্ধিপর কাম বাজাইতে' 'সার্জ্জি-ক্যাল ওয়ার্ডে' গিয়াছিল; রাত্রি হইয়া যাওয়ায় 'অন্ধা বুড়াকে' দয়া করিয়া কম্পাউণ্ডার-সাহেব দিয়াশালাই কাঠি জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া আনিতেছিলেন, কিন্তু বাক্স খালি হওয়ায়, অবশেষে হাত ধরিয়া পথটুকু পার করিয়া দিতেছেন।

নমিতা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলা শুনিয়া লইল, দত্তজায়ার কথার উত্তর দিতে ভুলিয়া গেল।

দত্তজায়া পুনশ্চ বলিলেন, "তুমি কি হাঁস্‌পাতাল থেকে আস্‌ছ ?"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "না; স্মিথের কুঠি থেকে আস্‌ছি; হাঁস্‌পাতালে যেতে পারি নি।"

দত্তজায়া ব্যগ্রভাবে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন। খুব সম্ভব, তাহা কৈফিয়তের "কেন ?"—কিন্তু হিতলালবাবু মাঝে পড়িয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আজ তা হ'লে আপনাকে আর হাঁস্‌পাতালে যেতে হবে না ? বেশ ত, চলুন না তা হ'লে আমাদের ওখানে তাসটাস খেলা যাক্। ব্যারিষ্টার পিয়ার্সনের মেয়ে মিস্ এলিন্ আস্‌বেন, আরও অনেক ভাল ভাল লোক থাক্‌বেন। চলুন সকলের সঙ্গে 'ইণ্ট্রোডিয়ুস করে দেব আপনার; চলুন চলুন...।"

স্বল্প-পরিচিত ভদ্রসন্তানটির নিকট অতর্কিতে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের তাড়া খাইয়া নমিতা হঠাৎ থতমত খাইয়া গেল। হতবুদ্ধির মত ক্ষণেক নির্ব্বাক্ থাকিয়া, কোনওরূপে আত্মদমন করিয়া শিষ্টভাবে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, "তাসখেলা...ক্ষমা করুন্।"

হিতলালবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন, আপত্তি কি ?"

নমিতা গোলে পড়িল; ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাড়ীতে বড় কাজ আছে। না হ'লে, এ সৌভাগ্য...!"

হিতলালবাবু পরম আগ্রহে বলিলেন, "বাজে ওজর রাখুন। বাড়ীতে কাজ মানুষের চিরদিনই থাকে. তা বলে কে আর...। এই ত মিসেস্ দত্ত যাচ্ছেন, ডাক্তার প্রমথবাবুও এখুনি আসবেন। আপনাকে নিয়ে যেতে পারলে 'পার্টি' জম্‌মে ভাল। আপ্‌নার কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। কি বলেন মিসেস্ দত্ত! হা—হা—হা—!" এইরূপে তিনি খাম-খেয়ালি কৌতুকে জোর গলায় হাসিয়া উঠিলেন। দত্তজায়ার দৃষ্টিতটে অপ্রসন্নতার মেঘ ঘনাইয়া উঠিল; কোনওমতে অনিচ্ছার দমন করিয়া তিনি সোসাহেবের তোষামোদের সুরে একটু খাপ্‌ছাড়া হাসি হাসিয়া মাথামুণ্ড উত্তর যোগাইলেন,"—বিলক্ষণ!"

সে-কথার অর্থটা এ-ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবব্যঞ্জক হইবে, তাহা দত্তজায়া স্বয়ং বুঝিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু একটা কিছু বলা ত চাই, তাই তিনি যাহা মুখে আসিল তাই বলিলেন।

হিতলালবাবুর সে হাসি নমিতার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নমিতার মনে পড়িল যে ছেলেবেলায় সে তাস খেলিতে খুব ভাল বাসিত বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সে আর তাস হাতে করে নাই। নমিতা মনটা চাঙ্গা করিয়া লইল। সবিনয়ে সেই কথাটা ব্যক্ত করিয়া এ প্রসঙ্গের মুড়া মারিয়া দিয়া নমিতা বিদায় লইবার সঙ্কল্প করিল; কিন্তু তখনই পরিহাস-রসিক হিতলালবাবুর ঘৃণিত-কঠোর হৃদয়হীনতার হাস্য-লাঞ্ছিত প্রকাণ্ড মুখখানার উপর দৃষ্টি পড়িতেই মন দমিয়া গেল। অসম্ভব! না, কিছুতেই না! এখানে সে-কথা ব্যক্ত করিয়া উহাদের উপহাস-হাস্য-বিচ্ছুরিত রঙ্গদার যুক্তি তর্ক উপদেশ শুনিয়া সে হৃৎপিণ্ডের কাঁচা ঘা-টা বেত্রাহত হইতে দিবে না। তাহাতে মিথ্যা কহিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়, সেও

ভাল! নমিতা ধীরভাবে বলিল, "আমি তাস খেলতে জানি না।"

হিতলালবাবুর উৎসাহ অসীম! তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না জানেন, নেই নেই; আমি শিখিয়ে দেব। চলুন। রাতদিন মেথর-মুদ্দফরাসের সঙ্গে মড়া ঘেঁটে মনটা জেরবার্ হয়ে পড়ে না! একটু আধটু বেড়ান চ্যাড়ান চাই বই কি? আপনার মত বয়েসের লোকের এমন কোটর-প্রিয়তা আমি কারুর দেখি নি! সব অনাসৃষ্টি! চলুন, আজ আর ছাড়্‌ছি নে, বড় বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেব। এও ত একটা কম লাভ নয়!"

এমন প্রবল প্রলোভন, প্রচণ্ড সহৃদয়তা, ক্ষীণপ্রাণা নমিতার পক্ষে বড়ই বিষম অসহ্য ঠেকিল! তা ছাড়া, ভদ্রলোকের অনুরোধ ক্রমশঃ ধৃষ্টতার অঙ্কে গড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া নমিতা মনে মনে বেশ একটু শঙ্কিতাও হইল। দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "এখন আমি যেতে অক্ষম। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ। তাছাড়া, নিজের হাতে ক্লোরোফর্ম দিয়ে যাওয়ায় অল্পক্ষণ হোল স্মিথের কাছে 'অপারেশন' করিয়ে আস্‌চি। কিছু মনে কর্ব্বেন না। নমস্কার।"

কাপড়ের আড়াল হইতে 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটা বাহির করিয়া সসৌজন্যে নমস্কার করিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।" নমিতা অগ্রসর হইল। সুরসুন্দরও বৃদ্ধকে লইয়া চলিল।

তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে উভয়ের পানে চাহিয়া দত্তজায়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন। সুরসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, হিতলালবাবু তীব্র ঈর্ষাকুল কটাক্ষে তাহারই পানে চাহিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতে বকিতে যাইতেছেন। সুরসুন্দরের দৃষ্টিতে ক্ষিপ্ত-ঘৃণার বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। সে সবেগে মুখ ফিরাইল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

বিংশ অধ্যায়—পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুকুর।—

অনেকে কুকুরের গাত্রে একটা জামা পরাইয়া তাহাকে বাটীর বাহির করেন। শৈত্য-নিবারণই এরূপ প্রথার যুক্তি। আব্-হাওয়ার তারতম্যানুসারে কুকুরের সর্দ্দি হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমার মতে আব্‌হাওয়ায় সর্দ্দি তত্তটা সম্ভবপর নহে, যতটা আর্দ্র গৃহে। সত্য বটে, কুকুরে শৈত্য পছন্দ করে না। ইহার প্রমাণ এই যে, দ্বারের সম্মুখে যথায় বায়ুস্রোত প্রবাহিত, তথায় কুকুর কখনও থাকিবে না; বরং শয্যার উত্তাপে শুইয়া থাকিতেই পছন্দ করিবে। ইহাতেই বোধ

হয় যে, শৈত্য কুকুরের মনোমত নহে। কিন্তু তা বলিয়া যে, তাহার একটা কাপড়ের জামা আবশ্যক, তাহা আমি বিবেচনা করি না। কুকুরের গৃহ আর্দ্র না হইলেই হইল।

কুকুরেরা যেমন শৈত্য পছন্দ করে না, তদ্রূপ তাহারা গরমও পছন্দ করে না; সুতরাং, প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় কুকুরকে বাঁধিয়া রাখাই বিধি। কুকুরকে স্নান করান উত্তম প্রথা নহে। তাহাকে মাসে একবার স্নান করাইলে যথেষ্ট হইবে; কিন্তু প্রত্যহ তাহার চুল আঁচ্‌ড়ান আবশ্যক। স্নান করাইতে হইলে, শীতকালে বেলা ১২টার সময় এবং গ্রীষ্মকালে ৯টার সময় স্নান করান উচিত। অনন্তর তাহার গাত্র মুছাইয়া দেয়া যুক্তিযুক্ত। সাবান্ দ্বারা কুকুরের গাত্র পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, তদ্দ্বারা কুকুরের কেশের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। সাবান যেমন মানবের কেশের ক্ষতি-কারক তেমনি তাহা কুকুরের চুলের। ডিম্ব লাগাইলে কুকুরের চুলের পরিচ্ছন্নতার বৃদ্ধি করে। চুলে পোকা হইলে প্রত্যেক ডিম্বের সুস্থমে এক চামচ তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে পোকা মরিয়া যায়।

কুকুরকে কখনও কেবলমাত্র ভাত বা রুটি খাওয়াইয়া রাখিবে না। কুকুরেরা মাংসাশী জন্তু। তাহাদিগের দাঁতই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সুতরাং, তাহাদিগকে মাংস হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। মাংসে হরিদ্রা বা গরম-মশ্‌লা দিবে না। প্রত্যহ সপ্তাহে খাদ্যের উপর এক চামচ গন্ধক-চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। কুকুরেরা অস্থি বড় ভালবাসে। সুতরাং, মাংসের সহিত একটু অস্থি দেওয়া বিধেয়। কুকুরের জন্য জল এরূপ স্থানে রাখিবে যেন সে তাহা জানিতে পারে। কুকুর যদি খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে তাহাকে খাওয়াইবার কখনও চেষ্টা করিবে না। অজীর্ণ হইলে কুকুরেরা খাইতে চাহে না। অনাহার-দ্বারা উক্ত রোগের প্রতিকার করিতে চাহে। সুতরাং, সেরূপ স্থলে খাইতে দেওয়া অনুচিত।

কুকুরের রোগের ঔষধি।

দাস্ত—দাস্ত করাইতে হইলে এক চামচ শুষ্ক লবণ কুকুরের মুখে দিলে তাহার দাস্ত হইবে।

দুর্গন্ধ :—দুর্গন্ধ হইলে কৃষ্ণ লবণ ½ ছটাক ও হীরেকশ ½ ছটাক একত্র করিয়া আট আনা পরিমাণ খাদ্যের সহিত খাইতে দিবে।

অজীর্ণ :—খয়ের এক ড্রাম, খড়ি ২ ড্রাম, মিশ্রিত দালচিনি ও লবঙ্গ ½ ড্রাম, অহিফেন ৬ গ্রেণ মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং একটি করিয়া বটিকা দিনে তিন বার তাহাকে দিবে।

জ্বর :—কুইনেন ২০ গ্রেণ সেবন করানই বিধি।

কৃমি :—কৃমি হইলে ১২ ঘণ্টা কুকুরকে কিছুই খাইতে দিবে না। অতঃপর ওজন করিয়া প্রতিপাউণ্ড ওজনের গুরুত্বে এক গ্রেণ করিয়া সুপারি-চূর্ণ খাওয়াইয়া এক ঘণ্টা পরে রেড়ির তৈল পূর্ণ মাত্রায় খাওয়াইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শিক্ষিতা স্ত্রী।

(ইংরাজী অবলম্বনে)

"আমি আপনার সহিত একমত হ'তে পাচ্ছি না। শিক্ষিতা স্ত্রী একটা অভিশাপ"—রামদাসবাবু মাথা নাড়িয়া এই কথা কহিলেন।

"তাই কি? কেন?—কিসে?"—এই বলিয়া মিষ্টার বসু হাসিলেন।

রা। তবে শুনুন, প্রথমতঃ, তা'রা বড় ব্যয়বহুল।

বসু। কোন্ বিষয়ে?

রা। অনেক বিষয়েই অনেক ব্যয় কর্‌তে হয়, তাদের জন্যে।—শিক্ষিতা স্ত্রীর হাল্ 'ফ্যাশানে'র সৌখীন পোষাক অন্ততঃ মাসে একবার নূতন হওয়া চাই; তা'র 'পাউডার' চাই, 'পমেটম' চাই, সাবান চাই, ক্রিম চাই, ব্যাণ্ডেণ্ডার চাই, নানাপ্রকার সুগন্ধি এসেন্স চাই। তারপর হাওয়া খেতে 'মোটর কার' চাই, 'এয়ারোপ্লেন'—'সবমেরিন' সবই চাই।

বসু। আরও কিছু?

রা। আচ্ছা, আপনি যদি এইভাবে আমাকে বাধা দেন, তবে কিছু বল্‌বো না।

বসু। ক্ষমা কোর্‌বেন ম'শায়! আমি আপনাকে বাধা দিচ্ছি না; কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা কর্‌তেছি—তারপর?"

রা। শুনুন, তা'র হারমোনিয়ম চাই, পিয়ানো চাই; সেতার, এসরাজ, বেহালা কত কি চাই! কাজের মধ্যে তিনি প্রেমসঙ্গীত গাইবেন, আর কেবল বাজে গল্প করে, সভাসমিতিতে গিয়ে সময় কাটাবেন। এই জন্যে আমি, ম'শায়, শিক্ষিতা স্ত্রী মর্ম্মে মর্ম্মে অপছন্দ করি।

বসু। তবে আপনি বলতে চান্ যে, পরিণীতা স্ত্রীটীর বিনা মাইনের নির্ব্বাক্ চাকরাণী হওয়া উচিত?

রা। না হে, ম'শায়, তা নয়, সে কথা কে বলে?"

বসু। কিন্তু আপনি এখুনি বল্লেন যে, আপনি শিক্ষিতা স্ত্রী পছন্দই করেন না।

রা। না, না! আমার বল্‌বার সে অর্থ নয়! আমি বল্‌ছি, স্কুল-কলেজে পড়া স্ত্রী ভাল নয়। আমি মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে নই।

বসু। আহা! তাই বলুন না কেন? আপনি যে নিজের সীমা সংকীর্ণ করে ফেল্‌-ছেন!—বলুন ত, কলেজে পড়া সকল মেয়েরাই অপরিমিতব্যয়ী?"

রা। হাঁ, প্রায় সকলেই বটে।

বসু। তবে বলুন, আপনি তাদের মধ্যে কতজনকে জানেন?

রা। জানি, এই দু' একজন।

বসু। ওঃ! তবে আপনার এ বিষয়ে জ্ঞানের ভিত্তিই স্থাপিত হয় নি। ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতার উপর—?

রা। না না, ঠিক্ তাই নয়। আপনি যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমার মতের সমর্থন কর্‌বে।

বন্ধু। হাঁ, সে খুব কম; অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক! আপনি বল্‌ছেন, "যে কোনও শিক্ষিত ভারতবাসীকে।" আচ্ছা, আমি একজন শিক্ষিত ভারতবাসী। কৈ, আমি ত সমর্থন কর্‌ছি না। আর আমার স্ত্রীকে ত আপ্‌নি জানেনই! তিনিত একজন গ্রাজুয়েট? কিন্তু কৈ তিনি কখনও ত প্রতিমাসে—এমন কি প্রতিবৎসরেও বহুমূল্য পরিচ্ছদ বা অলঙ্কারের প্রার্থনা করেন না! অথবা 'মোটর কারে'র জন্য আব্‌দারও করেন না। বরং আমার সংসারের তিনি এমন সুব্যবস্থা করে চালান, যাতে আমি—।" পত্নী-গুণমুগ্ধ বন্ধু-মহাশয়ের পত্নীর গুণব্যাখ্যা রামদাসবাবুর আর সহ্য হইল না। তিনি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "আপনার কথা ছেড়ে দিন। ও রকম সকলের হয় না। কিন্তু তথাপি শিক্ষিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ।

বন্ধু। কোন্ কোন্ বিষয়ে বলুন?

রা। সকল বিষয়েই।

বন্ধু। অনুগ্রহ ক'রে স্পষ্ট ক'রে প্রকাশ করুন, দেখি।

রা। শিক্ষিতা স্ত্রীরা আয় অপেক্ষা অনর্থক ব্যয় অধিক করেন।

বন্ধু। কেন? শিক্ষার গুণে কি তাদের আয়-ব্যয়ের জ্ঞানের অভাব ঘটে? তারা কি আপন স্বামীর ধন-সকল ছড়িয়ে উড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে দেয়? শ্রমশ্রান্ত শরীর-মনকে মধ্যে মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদ-আহ্লাদে প্রফুল্ল করার জন্য সঙ্কিত দু'এক পয়সা খরচ কর্‌লে বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং লাভ আছে;—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে মন বসে ভাল। তোমরা 'থিয়েটার' যাবে, 'বায়স্কোপে' যাবে, স্বাধীনভাবে, সংসারের যেখানে যে আনন্দটুকু আছে, সে সকল অবাধে ভোগ কর্‌বে, আর নিম্ন-পক্ষ রক্ষার জন্যে বল্‌বে পুরুষ-মানুষের এত কর্ম্ম-ময় জীবনে ক্লান্তিদূর আর আরামের জন্য এ সকল চাইই। কিন্তু তোমার সঙ্গে সমান সুখ-দুঃখের ভাগী, সাংসারিক কাজে অশ্রান্ত পরিশ্রমী, একই ভাবে যার সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাটে, তোমার সেই সৌখশায়নিকী স্ত্রীর আনন্দ উপভোগের জন্য কি রাখ? একটু আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করলে, একটু সুশিক্ষা পেলে অনেক সময় তার চিত্তভার লঘু হয়। তুমি তাতেও খড়্গহস্ত! তুমি কি তাকে একটি কলকারখানার জড় পদার্থের, বা ক্রীত-দাসীর মত রাখ্‌তে চাও? তুমি দেখছই, আমি আমার নিজের স্ত্রীকে 'বায়স্কোপ' প্রভৃতি সব দেখিয়ে আনি, মধ্যে মধ্যে।

রা। না, না। আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌ছি না। আমি সাধারণের কথা বল্‌ছি। আমাদের সমাজের বিশৃঙ্খলা দেখে।

বন্ধু। সব সময় স্ত্রীকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে আমোদ দিবারই বা কি আবশ্যকতা? তিনি নিজের ঘরেই যথেষ্ট আমোদ পেতে পারেন। আর বাহিরে মেয়েদের যাওয়াও সকল সময়ে হিতকর নয়। তাতে বাড়ীতে বসে নিজের ঘরে গান-বাজ্‌না প্রভৃতি করতে দাও, উপদেশপূর্ণ পুস্তকের সাহায্য দাও, লেখা-পড়া করতে দাও, নিজে তার শিক্ষার সাহায্য করে দাও, তার সঙ্গে উন্নতি-বিষয়ে আলোচনা কর, তা'হলেই দেখ্‌বে তার শরীর ও মনের

উন্নতি হবে, সে অনেক আনন্দ পাবে; সর্ব্বদাই প্রফুল্লমুখী থাকবে।

রা। হাঁ, হাঁ, আমি স্বীকার করি, আপনি যা বলছেন। কিন্তু কিন্তু —।

বন্ধু। না, আর কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে। আপনি যে ঠিক্ Goldsmithএর সেই গ্রাম্য পাঠশালার স্কুলমাষ্টারের মত, পরাস্ত হবেও হচ্ছেন না; তর্ক বজায় রাখ্‌তে চাচ্ছেন। হাঃ হাঃ!

রামদাসবাবু নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিবার মানসে বলিলেন, "আচ্ছা, মিষ্টার বসু, আপনাকে নমস্কার। আমার এখন একটা বিশেষ দরকার আছে; আমি চল্লুম।"

বন্ধুকে চলে যেতে দেখে, মিষ্টার বসু তখন অপ্রতিভের হাসি হেসে অগত্যা উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

স্নিগ্ধ আলোকে ভরিয়া হৃদয়,
প্রকাশিল ঐ দ্বিতীয়া-রবি;
উদিল বঙ্গের প্রতি ঘরে ঘরে
ভাই-ভগিনীর মিলন-ছবি!
জাগো এবে ত্রিশ কোটী নরনারী!—
সাদর আগ্রহ ভগিনী-পরাণে।
সারা বঙ্গের আনন্দ হরষ
ফুটিয়া উঠুক ভ্রাতার কল্যাণে!
হে শুভ দ্বিতীয়া-লগন আজিকে,
অভিষেক তব আমাদের ঘরে।
সুগন্ধ চন্দনে শিশির-বুহুমে
পবিত্র প্রসূন কোমল হারে।
তোমার স্নেহের চরণ-পরশে
আসুক সম্পদ্ আসুক শান্তি।
দূর করে দাও হিংসা-দ্বেষ যত,
মলিনতা-ভরা বিষাদ-ভ্রান্তি।
আন হে আনন্দ তোমারি নামেতে,
তোমারি পূজায় হউক সিদ্ধি।
ভাই-ভগিনীর একতা-বন্ধনে
ভারতে আসুক উন্নতি-বৃদ্ধি॥

শ্রীসরোজিনী দেবী

পুণ্য-তীর্থ।

জগতে তীর্থের মাহাত্ম্য সকলেই অবগত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল জাতিই তীর্থ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রোল্লিখিত ও বহুকাল হইতে শ্রদ্ধার সহিত লোক-মুখে বিঘোষিত সেই সকল তীর্থের নাম উচ্চারণ করিলে মানবের

মনোমধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়। সেই সকল তীর্থে যাইবার জন্য লোক ব্যাকুল হইয়া উঠে। অর্থব্যয়, শক্তিব্যয় স্বাস্থ্যক্ষয়, প্রভৃতি নানাবিধ বিপৎ-পাতের সম্ভাবনা থাকিলেও নরনারী তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইতে ক্ষান্ত হয়েন না। তীর্থ-স্থান ধর্ম্মে বিজড়িত, শ্রদ্ধায় আবৃত ও আগ্রহে মণ্ডিত। ইহা লোকের ধর্ম্মাকাশের ধ্রুবতারা। ইহা জীবনাকাশের স্বাতিনক্ষত্র; ইহার একবিন্দু জলে যাত্রীর মনে মুক্তা ফলে —মোক্ষ-ফল উৎপন্ন হয়।

তীর্থ-পর্য্যটন-বাঞ্ছা পাপীর মনে তাহার পাপ-মোচনের আশার সঞ্চার করে এবং ধার্ম্মিকের মনকে ধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল ও বিভাসিত করে। ইস্‌লাম জাতির তীর্থ মক্কা-মদিনা, ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপবাসী-দিগের তীর্থ জেরুসেলাম এবং হিন্দুদিগের-তীর্থ কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, বদরিকাশ্রম, চন্দ্রনাথ, অবন্তিকা প্রভৃতি। এই সকল স্থানে যাইবার জন্য যাত্রি-গণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আমাদিগের হিন্দুর গৃহে পূর্ব্বে কত নরনারী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সুখময় সোনার সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া, সুকুমার শিশুদিগের স্বর্গ-জ্যোতি-বিভাসিত পবিত্র কোমল মুখ-কমলের সুন্দর হাস্যের ছটা ভুলিয়া, তীর্থে ধাবমান হইতেন। পথিমধ্যে শ্রমে ও অনাহারে শরীর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, জীবন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলেও তীর্থ-ফল-লাভের আশায় তীর্থগামী ব্যক্তি তীর্থ-যাত্রা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। অস্মদ্দেশে যখন বাষ্প-শকটের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কত ব্যক্তি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করিবার পূর্ব্বে 'উইল'-পত্র সম্পাদন করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। কিন্তু তথাপি এরূপ বিপৎ-সঙ্কুল তীর্থ-যাত্রা লোকে ভুলিতে পারিত না। কত তীর্থযাত্রীকে দস্যুদল পথিমধ্যে আক্রমণ করিত, যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত, এবং অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া চলিয়া যাইত। তবুও তীর্থ-বিশ্বাসী তীর্থ-ফলাকাঙ্ক্ষী যাত্রী তীর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিত না।

আমরা হিন্দু; আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন। আমরা পরমার্থ তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যস্ত; সর্ব্বদাই ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। ধর্ম্মই আমাদিগের চরম বস্তু, পরম পবিত্র মহারত্ন। আমাদিগের দেশে যত ধর্ম্মালোচনা হয়, এমনটী জগতের আর কোথায়! আমরা খাইতে, শুইতে, উঠিতে বসিতে ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদিগের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মই আমাদিগের ধন, মান, জ্ঞান ও প্রাণ—আমাদিগের জীবন-সর্ব্বস্ব। আমরা ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু-জাতি। ধর্ম্ম আমাদিগের জাতীয় মেরুদণ্ড, আমাদিগের গৌরব-নিশান। পুণ্যসঞ্চয় আমাদিগের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য। স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য আমরা বিলক্ষণ বুঝি। একটী কার্য্য করিবার পূর্ব্বে স্বর্গের পবিত্র সুখ ও নরকের দারুণ যন্ত্রণা আমরা কল্পনার চক্ষে যত দেখিয়া থাকি, হৃদয়ে যত ভাবি, এত আর কোন্ জাতি করে? আমরা যমদূত ও বিষ্ণুদূতের কথার আলোচনা করি।

আমাদিগের দেশবাসী অতিশয় তীর্থ-প্রিয় এবং সর্ব্বদাই তীর্থ-গমনে লালায়িত হইলেও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব গৃহ যে এক একটি পুণ্যক্ষেত্র তীর্থ-ভূমি, তাহা বোধ হয়, অনেকেই মনে ভাবেন না। এই তীর্থের জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, আকাশ, রবি, চন্দ্র, তারা সকলই পবিত্র, মনোহর, সুন্দর! এই তীর্থে কি না আছে? সকলই আছে। দয়া, মায়া, স্বার্থশূন্যতা, সহানুভূতি, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সকলই আছে। ধর্ম্ম শিখিবার ও শিখাইবার এমন সুন্দর স্থান আর পৃথিবীতে, বুঝি, কুত্রাপি নাই। আমাদিগের এই গৃহ এক একটী আশ্রম ও তীর্থ। ইহাতে কত ধর্ম্মপ্রাণ মুনি ঋষি বাস করিয়া গিয়াছেন। ইহা কত রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পদার্পণে পবিত্রীকৃত হইয়াছে! এমন সুন্দর পবিত্র তীর্থ-ছবি আর কোথায় আছে!

এই গৃহ-তীর্থে আকাশ হইতে উচ্চতর পিতা, এবং বসুন্ধরা হইতে গুরুতরা মাতার যিনি সেবার মত সেবা করিতে পারেন, তাঁহার কিসের ভাবনা? তাঁহার তীর্থফল হাতে হাতে। তাঁহাকে অধিক দূরে বাহিরে যাইতে হইবে না—গৃহে বসিয়াই পাইবেন। এ স্থানে "ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা" রূপ আজ্ঞা যিনি শিরে বহন করিতে পারেন, তিনি ধন্য;—তাঁহার মনের সুখ ও পুণ্য যথেষ্ট! যে জনক-জননী সুকুমার শিশুদিগকে স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অন্নজ্ঞানাদি প্রদান করিয়া সুখ-সম্ভোগ করেন—তাহাদিগের বিমল আনন্দ—স্বর্গসুখ—পুণ্য-তীর্থের চরম ফল।

এই গৃহ-তীর্থের এক দেবতা স্বামী। স্বামি-সেবাই হিন্দু রমণীর প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কায়মনোবাক্যে স্বামীর আরাধনা করেন, তিনি ইহ-পরকালে স্বর্গসুখ লাভ করেন। অস্মদ্দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় রমণীগণ এই তীর্থের এক একটী আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের জীবনের দেব-জ্যোতি-বিকশিত আলেখ্যে প্রত্যেক হিন্দু-গৃহ সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক।

যে হিন্দুর পুণ্য-গৃহ সুন্দর শিশুদিগের প্রভাতকমলসদৃশ মুখকান্তিতে সুশোভিত, বালক-বালিকাগণের নির্ম্মল হাস্যে পরিপূর্ণ, আত্মীয় স্বজনের স্নেহময় মঙ্গল-বাক্যে আনন্দযুক্ত, দাস-দাসীগণের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়নে আনন্দিত, জনক-জননীর স্নেহ সম্ভাষণে মুখরিত, স্বামি-স্ত্রীর সোহাগবচনে প্রফুল্লিত, তাঁহার তীর্থস্থান আর কোথায়?

মানবের গৃহই তাঁহার তীর্থস্থান। তথায় তিনি সুন্দররূপে ধর্ম্মালোচনা করিতে পারিলে তাঁহার সমস্ত তীর্থ-কামনা পূর্ণ হইবে। তাঁহার গৃহই তাঁহার পুণ্য-তীর্থ। অন্যত্র গমন করিতে হইবে না। তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হইবে। যিনি এই, গৃহ-তীর্থের পুণ্যসলিলে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ও পবিত্রভাবে অবগাহন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! তাঁহার জীবন সার্থক।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পরিতৃপ্তি।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে)

নিশীথিনী বৃথা কর অনুরোধ,
শিশুটী কি পেয়েছ আমায় ?
চিরন্তনী'র মিটে প্রবল তিয়াসা
'আসুখ' 'আনার' 'বেদনায়' ?

জ্বালায়ে প্রাণে জ্বলিলে অনল
ধূ ধূ ধূ ধূ রাবণের চিতা,
নাহি বল, নাহি যে অভয়,
চিন্তা-ভারে রহি ক্লান্ত ভীতা !

শূন্য মোর হৃদয়-মন্দিরে
যবে হবে পূজা-আয়োজন,
দেবতারে অরঘ সঁপিয়া
দূরে যাবে তিয়াসা ভীষণ।

৺হেমন্তবালা দত্ত।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে অনেক দিনের কথা। কলিকাতায় ——নং কলেজ ষ্ট্রীটে, রমাকান্ত ঘোষ, এল্, এম্, এস্-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাড়ীটি বেশ সুন্দর। উপরতলায় ডাক্তারবাবু সপরিবারে বাস করিতেন; নীচের তলায় ডিস্‌পেন্‌সারি ছিল। ডাক্তারের চেহারা পরম সুন্দর। লোকে তাঁহাকে ধার্ম্মিক, চরিত্রবান, মিষ্টভাষী বলিয়া জানিত। সকলে মনে বুঝিত ডাক্তারের চিকিৎসা-বিদ্যায় যেমন অভিজ্ঞতা, হাতযশঃও সেই রকম। এ-রকম লোকের প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে বেশী দিন লাগে না। অল্প দিনের মধ্যেই রমাকান্তের অর্থ ও যশঃ অর্জ্জিত হইতে লাগিল।

কিশোর বয়সেই রমাকান্ত মাতাপিতৃহীন হইয়া, পৈত্রিকভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা করেন। এখন পরিজন বলিতে, একমাত্র ভার্য্যা ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীও মাতাপিতৃহীনা। তাহার পিতৃকুলে কেবল অগ্রজ গোপীনাথ এবং ভ্রাতৃজায়া মোহিনী ছিলেন। শ্বশুরকুলে স্বামী ভিন্ন অন্য কোনও আত্মীয় ছিল না। অতএব বালিকা-বয়স হইতেই ভুবনেশ্বরী তাহার হৃদয়পূর্ণ শ্রদ্ধা, প্রীতি ও মমতারাশি তাহার স্বামীর চরণে অঞ্জলি দিল। সে-দান রমাকান্ত যেমন সাদরে গ্রহণ করিলেন, তেমনি সাগ্রহে প্রতি-দানও করিলেন। এমনি সুখের দিনে তাঁহাদের একটী পুত্র-সন্তান জন্মিল।

সেবারে আষাঢ় মাসের প্রথমে পুরীধামে রথযাত্রা দেখিতে রমাকান্তের বন্ধুবান্ধবেরা অনেকে ইচ্ছুক হইলেন। কয়জনে রমাকান্তকে তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য চাপিয়া ধরিলেন। রমাকান্তের দেশ-ভ্রমণের সাধ চিরদিনই প্রবল। বন্ধুগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহা আবার প্রবলতর হইয়া উঠিল। তাই একদিন পত্নীর হাতে ধরিয়া, দুই-বৎসরের পুত্র সুধীরকে চুমা খাইয়া, ধীরে ধীরে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

শুনিয়াই ভুবনেশ্বরীর বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। দূরদেশে যাওয়া; অসুখ-সম্ভাবনা, শুশ্রূষার ত্রুটি—পলকের মধ্যে এমনি কত কথা তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় খেলিয়া গেল। আসল কথা, সে তাহার স্বামীকে—সে তাহার একমাত্র সুহৃদ্, একমাত্র আত্মীয় স্বামীকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারে না। কিন্তু ওঁর যখন পুরীতে যাইবার এত আগ্রহ, তখন তাহাতে বাধা দেওয়াও বড় স্বার্থপরের কাজ। স্বামীকে একবিন্দু দুঃখ দিতে ত সে পারে না। তখন শ্রীক্ষেত্রযাত্রী বন্ধুবান্ধবদিগকে মনে মনে গালি দিতে দিতে, স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, সাধ্বী সলজ্জভাবে বলিল, "তা তুমি যদি যাও, তবে আমাদেরও নিয়ে চল। তোমায় ছেড়ে থাকা যায় না"। কথা শুনিয়া রমাকান্ত যেমন প্রীত তেমনি ব্যথিত হইলেন। পত্নীকে খুব আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কি ছেড়ে থাকা যায়, লক্ষ্মি? তোমার তবু দাদা আছেন, বৌদি আছেন। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল দেখি? এ জগতে আমার ভালবাসিবার যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমি; আমার যদি 'আমার' বলিতে কিছু থাকে, তবে সে তুমি। তোমায় ছেড়ে আমি কয়দিন থাকতে পারি বল ত? তুমি আমার উপরে রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটী আমার! আমরা বজ্‌-রায় চ'ড়ে যাব। তাতে তোমার আর খোকার যাওয়ার সুবিধে হবে না। শুনচি ওদিকে শীঘ্র রেল খুল্‌বে। তখন তোমাদের নিয়ে আবার বেড়া'তে যাব।"

তথাপি পত্নীর ম্লান মুখ এবং ছল-ছল চক্ষু দেখিয়া রমাকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার জন্যে কিছু ভেব না। তুমি ত ভগবানের চরণে নির্ভর কোরে থাকতে জা'ন। তাঁরই কৃপায় তোমরা ভাল থাক্‌বে, আমি ভাল থাকব। প্রত্যহ আমি তোমায় চিঠি লিখ্‌ব। এই কয়টা দিনের জন্য তুমি কেন কাতর হোচ্চ? তোমার হাসিমুখ না দেখ্‌লে স্বর্গে গিয়েও আমি আনন্দ পাব না। তুমি ত আমার মনের কথা জা'ন। আর দাদাকে তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে তোমার বৌদিকেও নিয়ে এস।"

এই সব কথার পরে ভুবনেশ্বরী আর কিছু কাতরতা প্রকাশ করিল না। যথাসময়ে গোপীনাথ ভগিনীর অভিভাবক হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তপ্ত অশ্রু মুছিতে মুছিতে রমাকান্ত ও ভুবনেশ্বরী, পরস্পরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীমা—।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

বঙ্গদেশ।—কালীঘাট।

কালীঘাট কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার নিম্ন দিয়া পূতসলীলা গঙ্গাদেবী কলনিনাদে প্রবাহিতা। প্রবাদ এইরূপ যে, সতী দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহার মৃত শরীর লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহাদেবকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত বিষ্ণু তাঁহার সুদর্শন-চক্র-দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যে যে স্থানে সতীর দেহাংশ পতিত হইল, সেই সেই স্থান পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত হইল। কালীঘাটে সতীর একটি অঙ্গুলি পতিত হয়। সুতরাং এখানকার কালী অত্যন্ত বিখ্যাত। হিন্দুরা কালীকে পরব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। কালী-নামে ভগবানের কালস্বরূপা শক্তিকে বুঝায়। অথবা কাল-শব্দে সংহার, ও ঈকারে তৎকর্ত্রী; অর্থাৎ সংহার-কর্ত্রী। ইহাই কালী-নামের ব্যাখ্যা। যাঁহাতে সকলই লয় পায়, তাঁহাকেই কালী বলা যায়। ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা; তাই কালরূপে সকলের আদিতে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে অন্য কোনও বস্তু ছিল না। সেইজন্য মনু "আসীত্তমোময়ং লোকমনর্ক-প্রহতারকং" বলিয়াছেন। ইহাতে আমরা ইহাই বুঝি যে, পূর্ব্বে কেবল অন্ধকারময় লোক ছিল, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপতি গ্রহ-তারকা কিছুই ছিল না। সুতরাং, সেই সময়কেই কালবাদীরা ব্রহ্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং, সেই কালস্বরূপ পরমাত্মা শক্তিযোগে কাল ও কালীরূপ প্রকাশে দুইরূপ হইলেন। শ্রুতিতেও আছে যে "স একাকী নরমেত, অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। অনন্তর সেই কাল ত্রিবিৎকরণ-দ্বারা তিনগুণে ব্যাখ্যাত হইলেন; যথা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; অথবা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব। মোট কথায়, সৃষ্টিকাল, স্থিতিকাল ও নিধনকাল। সর্জ্জনকালের নাম রজঃ; সুতরাং ইহা ব্রহ্মরূপ। স্থিতিকালের নাম সত্ত্ব; সুতরাং ইহা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুরূপ। সংহারকালের নাম তমঃ; সুতরাং রুদ্ররূপ। এই রুদ্রের নাম কালাগ্নি। অতএব কালী বলিলে হিন্দু ব্রহ্মকেই বুঝেন।

কালীর তিনটী গুণকে তিনটী চক্ষু বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কোথাও বা "চন্দ্রার্কানললোচন" ও বলিয়াছেন। এই সত্ত্ব-গুণ সোম, রজোগুণ রবি এবং তমোগুণ অগ্নি। তাই কালীর অন্য একটী নাম ত্রিগুণা; অর্থাৎ তিনিই আদ্যা সমস্ত-জগৎ-প্রকাশিকা, সমস্ত জগৎ-পালিকা এবং সমস্ত জগৎ-বিনাশিকা। সূর্য্যে উৎপত্তি, চন্দ্রে স্থিতি ও অগ্নিতে বিনাশ দেখা যায়। জীব-শরীরেও আমরা দেখিতে পাই, শোণিতে উৎপত্তি, শুক্রে স্থিতি এবং অগ্নিতেই লয়। এই শোণিত রজোরূপী সূর্য্য, শুক্র সত্ত্বরূপী চন্দ্র এবং রুদ্রস্বরূপ তমোরূপী কালাগ্নি। যে কালাগ্নি-দ্বারা জীব লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই কালী-নামে অভিহিতা।

পরব্রহ্মের নিকটে যাবতীয় বস্তু, কিছুই

অগোচর নহে। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালকেই দেখিতেছেন। এইজন্য কালী ত্রিনয়না। জীবমাত্রেই কাল-দ্বারা বিনষ্ট হয় বলিয়া জীব কালের হারস্বরূপ। তাই নানাবর্ণের নরমুণ্ড কালীর কণ্ঠভূষণ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় শ্রুতিই ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সুতরাং, কালীর কর্ণদ্বয়ে দুই শিশু সংলগ্ন আছে। শাস্ত্রে অর্দ্ধচন্দ্রজ্বলে অর্দ্ধমাত্রাকে নাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাই কালরূপ কালী নাদরূপে পরিণতা। সেই নাদই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেদের শিরোভাগে অবস্থিতি করেন। এ-কারণ, কালী প্রণব-স্বরূপা। কালীকে কেহ কেহ দন্তুরা ও বলেন; অর্থাৎ কালের দংষ্ট্রে সকলেই অবস্থিত। ইনি আলোল-রসনা শব্দেও অভিহিত হয়েন। এই শব্দ দ্বারা আমরা ইহাই বুঝি যে, জিহ্বার নাম রসজ্ঞা। আত্মার সত্তাতেই জগতের যাবতীয় রসাস্বাদন হইয়া থাকে। যাহেন্দ্রিয়ের রসাস্বাদনে কোনও ক্ষমতাই নাই। তাই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এ-কারণ, কালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছেন; অর্থাৎ তিনি 'আমিই সমস্ত রসের আস্বাদনকর্ত্রী, আমার সত্তাতেই জীবের রসবোধ হইয়া থাকে' ইহাই জানাইতেছেন।

কালী মুক্তকেশী। কেশ-শব্দে মায়া-জাল। পরব্রহ্ম হইতে মায়া অবতীর্ণা হইয়া জগৎকে আচ্ছাদন করে বলিয়া, মুক্তকেশী-শব্দে ইহাই বুঝায় যে, কালীর স্বরূপ-বেত্তা জীবের মায়া-পাশ হইতে পরিমুক্ত হয়। এই কারণেই কালীকে মুক্তকেশী বলা হয়।

কালী চতুর্ভুজা। শাস্ত্রে পুরুষার্থ চতুষ্টয় ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকে বলে। তাই এই চারিটী কালীর হস্ত। যে হস্তে বর সেই হস্তই ধর্ম্মস্বরূপ। যে হস্তে অসি তাহাই অর্থ। রাজ্যলাভেই সম্যক্ অর্থের লাভ হয়। বিনা অসি রাজ্যজয় হয় না। সুতরাং যুদ্ধার্থে জীবকে শস্ত্রপাণি হইতে হইবে। যে হস্তে মুণ্ড সেই হস্তই কাম অর্থাৎ অভিলাষ। বিনা শত্রু-নিপাতে অভিলাষ পূর্ণ হয় না। যে হস্তে অভয় সেই হস্তই বিশুদ্ধ মোক্ষ। যে পর্য্যন্ত জীব মোক্ষলাভ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহার ভয় দূর হয় না। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা ভয়হীন। এই জন্য কালীর অভয়প্রদ হস্তকে চতুর্ব্বর্গের শেষবর্গ মোক্ষস্বরূপ কহা হইয়াছে।

কালী দিগম্বরী। সর্ব্বব্যাপক কালের পরিধি নাই; সুতরাং চারিদিক্‌কেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন।

কালীর চরণতলে শবরূপে কালের অবস্থিতি। কাল শব্দে মৃত্যু। সেই মৃত্যু যে শক্তিতে পরাভূত হইয়া শববৎ পতিত আছে, তাহাই ব্রহ্মস্বরূপা কালী।

কূল্লা কুরুল্লাদি অষ্ট নায়িকা অষ্টসিদ্ধিরূপে ব্রহ্মরূপা কালীর পরিচর্য্যা করেন। ইহা-দ্বারা বুঝা যায় যে, পরব্রহ্মের পরিচারিকা অষ্টসিদ্ধি। শমদমাদি অষ্টাঙ্গযোগই অষ্ট নায়িকা। এইগুলিই লোকদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করে।

কালীঘাটে কালীর যে মন্দির দেখা যায়, তাহা ৩৩০ বৎসরের পুরাতন। বরিসার সাবর্ণ চৌধুরীর দ্বারা মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি মন্দির-পরিচালনার জন্য ৩৮৮ বিঘা জমী দান করেন। চণ্ডীচরণ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ মন্দিরের প্রথম ব্রাহ্মণ নিযুক্ত

হ'ন। তাঁহার বংশধরগণ হালদার-নামে খ্যাত। ইহাঁরাই মন্দিরের মালিক। দুর্গা-পূজার অষ্টমীর দিন কালীঘাটে আড়ম্বরপূর্ণ পূজাদি হইয়া থাকে।

তীর্থসেবিগণ কালীঘাট-দর্শন করিয়া নিকটবর্ত্তী নকুলেশ্বরের দর্শন করেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জল Hydrogen বা উদজান এবং Oxygen বা অম্লজানের মিশ্রণে উৎপন্ন বস্তু। এই দুইটি জিনিষ মিশে একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়ে গেছে। জল কখনও স্থির থাকে না, জল সর্ব্বদা নিম্নগামী, নীচের দিকে যায়; এবং নানা-স্থানে ফিরে ঘুরে শেষে সমুদ্রে পড়ে। জলের স্রোত জমির উপর এবং ভিতর দিয়া চলে। ভিতরের জলকে চোয়ান জল বলে। জল এইরূপ গতিশীল না হইলে আমাদের বড়ই কষ্ট হইত।

জলের মূল ভাণ্ডার সমুদ্র। সমুদ্রের জল নিতান্ত লোণা। মানুষ ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের জল এরূপ লোণা না হইলে, নষ্ট হইয়া যাইত। বিধাতা জল পরিষ্কার করিবার জন্য অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছেন। তাঁহার যন্ত্র চোয়ানের কল অহর্নিশ চলি-তেছে। সমুদ্র হইতে সূর্য্যের তাপে যে বাষ্প উঠে, তাহাতে লবণ কিম্বা অন্য কিছু জিনিষ থাকে না। সেই বাষ্প আকাশের উপর শীতল স্থানে গিয়া মেঘের আকার ধরে এবং এই মেঘ একত্র ও ঘন হয় এবং তাতে ঠাণ্ডা লাগিলে বৃষ্টি হয়। পৃথিবীর উপরে যেখানে যত প্রকার জল আছে এবং জড় উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে যে জল আছে, সে সমস্ত হইতেই বাষ্প উঠে। হিমালয় বা অন্যান্য শীতল পর্ব্বতে জলীয় বাষ্প বরফের আকার ধারণ করে এবং সূর্য্যতাপে সেই বরফ গলিয়া নানা আকার ধরে। প্রস্রবণ, নদ,নদী প্রভৃতি নানা-প্রকারের জলস্রোত হয়। নদী, প্রস্রবণ, হ্রদ আমাদের প্রধান জল-ভাণ্ডার। তা'ছাড়া পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিয়া জমির ভিতরের স্রোত হইতে জল উঠাইয়া লইয়াও আমরা ব্যবহার করি। পুষ্করিণী ও কূপ যথেষ্ট পরিমাণে গভীর না হইলে তা'র জল স্বাস্থ্য-কর হয় না। জমির উপরিভাগের মাটির তলায় এঁটেল মাটি আছে। সেই মাটিকে ভেদ করিয়া percolation (চোয়ান) এর জল যাইতে পারে না।

এই এঁটেল মাটি ভেদ করে জল আনিলে

জল খাইবার হয়, সেইজন্য কূপ এবং পুষ্করিণী ততটা গভীর করিতে হয়।

পুষ্করিণী এবং কূপের জল পরিষ্কার রাখিবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হয়। কারণ, জলের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার রোগ-বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের খানীয় পানীয় জল বিশেষভাবে পরিষ্কার হওয়া চাই। পানীয় জল প্রথমে ফটকিরি বা নির্ম্মলী ফল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দশ মিনিট ফুটাইয়া লইলে অনেকটা দোষ কেটে যায়। ফটকিরি অনেক প্রকার বীজ নষ্ট করে; কিন্তু ইহার পরিমাণ বেশী হইলে জল বিস্বাদ হয়।

জল আমাদের কি উপকার করে? জল ব্যতীত কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাঁচিতে পারে না। আমাদের শরীরের ওজনের প্রায় বার আনা অংশ জল। তার অল্প অংশই আমরা খাদ্য হইতে পাই। তাহার অধিকাংশই জল ও অন্যান্য পানীয় দ্রব্য হইতে পাই। জল ব্যতীত আমাদের kidney বা মূত্রাধার এবং অন্যান্য যন্ত্র কাজ করিতে পারে না, ঘাম ভালরূপে নির্গত হইতে পারে না, ত্বক (চামড়া) শুষ্ক ও অপরিষ্কার হয়। জল অভাবে আরও অনেক প্রকার অনিষ্ট হয়। উদ্ভিদ্ ফল মূল নানাপ্রকার আনাজ জন্মায় না। সেজন্য অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে অনেকেরই কষ্ট এবং কাহারও বা মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

স্বাভাবিক বৃষ্টির জলেই প্রায় সকল প্রকার ফসল রক্ষা করে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে খাল (canal)-দ্বারা নদী ও পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া ছোট ছোট নালা-দ্বারা ক্ষেতে জল দেওয়া যায়। এইরূপ জল দেওয়াকে Irrigation 'ইরিগেসন' বলে।

আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট (সরকার-বাহাদুর) লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া জল-প্রণালী, করেছেন। তদ্দ্বারা নানা স্থানের কৃষিকার্য্য চলে। এইরূপ না করিলে কত লোকের কত কষ্ট হইত। ইংরাজ-রাজ্যে প্রজার সুখ-সুবিধার জন্য কতই ব্যবস্থা আছে। সে সমস্ত জানিলে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা না করিয়া থাকা যায় না।

জলের আমাদের কতই প্রয়োজন! দেহ গৃহ, কাপড়, বাসন, প্রভৃতি জল ব্যতীত কি পরিষ্কার হয়? তৃষ্ণায় জলপান এবং ক্লান্ত উত্তপ্ত শরীরে স্নান করিলে যে কত সুখ ও আরাম হয়, তা কি একমুখে বলা যায়!

কে ভাঙ্গিতে পারে তৃষ্ণা শুখাইলে মুখ,
স্নানের সময় এত কেবা দিত সুখ!
জল বিনা একদণ্ড বাঁচিতে না পারি,
দয়াময় হরি তাই সৃজিলেন বারি।

শ্রীরাজমোহন বসু।

সাধুবচন-সংগ্রহ।

১। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে যিনি সহায় করিয়াছেন, ও তাঁহার উপরেই যাঁহার সকল আশা ভরসা, তিনিই সুখী।

২। বিজ্ঞেয়োঽক্ষরসন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্। বিহায় শব্দশাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্যতাম্॥ সন্মাত্র অক্ষর বস্তুই বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য, জীবনও চঞ্চল। সকল শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া, যাহা সত্য, তাহাই অবলম্বন কর।

৩। কবির শ্বাস সুফল সোই জানিয়ে,
হরিকা সুমিরণ পায়ে।

কবির বলিতেছেন, সেই শ্বাসই সফল জানিও, যে শ্বাস হরি-স্মরণেতে লাগিয়া যায়।

৪। কবির গোবিন্দ্‌কে গুণ গাওতে, কভু না কিযিয়ে লাজ্।

কবির বলিতেছেন ঈশ্বরের গুণগান করিতে কখনও লজ্জা করিও না।

৫। Sing unto the Lord with thanks-giving: sing praise upon the harp unto our God:

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রভুর গুণগান কর, বীণাবাদনপূর্ব্বক আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা গান কর।

৬। অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি শ্বপচ (চণ্ডাল) হইলেও কেবল সেইজন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করেন, তাঁহারাই হোম করেন, তাঁহারাই তীর্থস্নান করেন, তাঁহারাই আর্য্য (সদাচারী), এবং তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করে।

৭। কবির সোণা রূপা কাল হায়, কঙ্কর পাথর হীর্। এক নাম মুক্তামণি, তাকো জপহি কবির।

কবির বলিতেছেন, সোনা-রূপাই কাল; হীরা কাঁকর পাথর। এক নামই আমার মুক্তামণি; তাহাকেই কবির জপ করেন।

৮। সংসার আরতি করি মরিবার ডরে।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি ভব তরিবারে॥
(চৈতন্যদেব)।

৯। সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভাব পূর্ণ হইবে, ও অভাবের অতিরিক্ত দান পাইবে।

১০। কবির হরি-রস্ এয়ো পিয়া, বাকি রহিম ছাক।
পাকা কলস্ কোঁ ভারকা, বহুরি চড়ে না চাক।

কবির বলিতেছেন, হরিরস যে একবার পান করিয়াছে, তাহার আর কোনও রসের সখ্ থাকে না; যেমন পোড়া কলসী পুনরায় আর কুমারের চাকে চড়ে না।

১১। কবির কহৎ শুনৎ জগ্ জাৎ হায়,
বিষয়ন্ ভুলে কাল।
কহৈ কবির রে প্রাণিয়া!
বাণি ব্রহ্ম সঁভাল।

কবির বলিতেছেন, কহিতে কহিতে শুনিতে শুনিতে জগৎ চলিয়া যাইতেছে, বিষয়রূপ বিষে কালকে দেখিতে দিতেছে না। কবির তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, "রে প্রাণিগণ! ব্রহ্মের বাক্য সাম্‌লাও, অর্থাৎ ধরিয়া রাখ।"

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

নিদাঘের অপরাহ্ণ। প্রখর রবি সারাটি দিন ধরণীকে দগ্ধ করিয়া, বৃক্ষলতা-সকল ঝলসাইয়া দিয়া, পথিকের শিরে অগ্নিবর্ষণ করিয়া এইবার ক্লান্তভাবে পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মধুমতী-তীরে ঝাউ ও বটবৃক্ষের শাখায় বসিয়া বায়স উচ্চ চিৎকারে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে; অন্যান্য পক্ষিকুলও স্বস্ব রবে সন্ধ্যার আগমনী গাহিতেছে। নদীবক্ষে তরণী-সকল আরোহী লইয়া ধীর-মন্থর গতিতে গমনাগমন করিতেছে। দূরে বাষ্পীয় লৌহ-শকটের বংশীধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তন্মধ্যস্থিত আরোহিগণের অস্পষ্ট আয়তন গবাক্ষ-পথ দিয়া দেখা যাইতেছে। এরূপ সময়ে নদী-তীরে বসিয়া হরনাথবাবু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বায়ুকোণে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। পথের ধূলা উড়াইয়া বাতাস মেঘের সঙ্গে ছুটিল। পল্লী-বালক-বালিকাগণ ডালা-চুপ্‌ড়ি হস্তে লইয়া আম কুড়াইবার জন্য বাতাস ঠেলিয়া ছুটিল। তখনও বৃষ্টি পড়ে নাই; শুধু বাতাস বহিতেছিল। হরনাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহে ফিরিবেন কি-না, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় বাতাস ঠেলিয়া দ্রুত-পাদবিক্ষেপে সহাস্য আস্যে একটী ষোড়শ বৎসরের বালক আসিয়া একখণ্ড কাগজ হরনাথবাবুর হস্তে দিয়া বলিল, "বাবা, আমি 'পাস' হয়েছি; 'ফার্ষ্ট' হয়েছি। এই দেখুন, কাকা 'টেলিগ্রাম' করেছেন।" এই বালকটি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সুধীর; আর তাহার কাকা, হরনাথ-বাবুর জনৈক প্রতিবেশী; গ্রাম-সম্বন্ধে হরনাথ-বাবুর ভাই হ'ন্।

সুধীর 'টেলিগ্রাম'-খানি হরনাথবাবুর হাতে দিলে হরনাথবাবু তাহা দেখিবেন কি! আনন্দাশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। আর অলক্ষ্যে বক্ষ ভেদ করিয়া একটী দীর্ঘশ্বাসও যে না বহিয়াছিল, তাহা নহে! হায়, রাজলক্ষ্মি, আজ তুমি কোথায়? তোমার কত তপস্যার ধন সুধীর আজি প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে! —কত ধনাঢ্যের সন্তানকে অতিক্রম করিয়া দরিদ্র বালক আজি তাহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এ সুখের অংশ গ্রহণ করা রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যে নাই! তাই আজি হরনাথবাবুর এ আনন্দ-সংবাদেও দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়াছিল; আনন্দাশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে একবিন্দু শোকাশ্রুও ঝরিয়াছিল!

সুধীর বলিল, "'টেলিগ্রাম'-খানা পড়ে দেখুন না বাবা!" তখন হরনাথবাবুর চিন্তা-স্রোত রুদ্ধ হইল। তিনি 'টেলিগ্রাম'-খানায় চক্ষু বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ—বাবা, পড়েছি। এখন চল, মা কালীর বাড়ী পূজা দিয়া আসি।" তখন হরনাথবাবু গ্রাম্য কালী-মন্দিরে গিয়া পুত্রের মঙ্গল-কামনায় কালীর পূজা দিয়া আসিলেন।

যথাকালে গেজেট বাহির হইল; সুধীরের উচ্চবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রামের লোক ভাবিল, এছেলে কালে একজন 'কেষ্ট' "বিষ্টু"-গোছ না হয়ে যায় না। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সে এত বড় একটা হইয়া উঠিয়াছে; বিদ্যালয়ও ইহাতে গৌরবান্বিত হইল!

সুধীরের বাসনা, সে বি-এ, এম্-এ পড়িয়া কালে একজন কৃতবিদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হরনাথবাবুরও যে ইহা ইচ্ছা নহে, তাহা নহে; তবে তিনি এক বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। এবার সুধীরকে এফ্-এ পড়িতে হইলে কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাতা যাইলেই পিতা-পুত্রে বিচ্ছেদ ঘটিবে। একমাত্র নয়নমণি, অন্ধের যষ্টি, হৃদয়-নিধিকে প্রবাসে পাঠাইয়া তিনি কি প্রকারে গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন? সুধীরকে ছাড়িয়া তিনি কিরূপে জীবনধারণ করিবেন! কখনও বা তিনি মনে করিলেন, গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া তিনিও সুধীরের সঙ্গে কলিকাতায় বাস করিবেন। সুধীর ছাড়া তাঁহার কিসের সংসার! কিন্তু আবার সে কথাটা যুক্তি-সংগত বলিয়া মনে হইল না। কারণ, গৃহ-ত্যাগ করিয়া যাইলে ঘর-দোর ত সব মাটী হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন বাগান-বেড় জায়গা-জমী যাহা আছে, তাহাও যে নষ্ট হইয়া যাইবে! ফসল যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহাও আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের তাহাই যে একমাত্র উপায়! সুধীরও মনে মনে এইরূপ কত চিন্তা করিতে লাগিল। কখনও বা সে কল্পনায় পিতাকে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর করিয়া তুলিত। আবার কখনও বা পিতৃ-বিরহজনিত আশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িত। বিদেশ বিভূমে একা সে কিরূপে থাকিবে! সেখানে কে তাঁহাকে এমন স্নেহ যত্ন করিবে? বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন-কালে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে কে তাহার প্রতীক্ষা করিবে? আর সেই-বা গৃহে ফিরিয়া কাহার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবে? সেখানে ত বাবা নাই! সে যে মাতৃহারা বালক! পিতার অপরিসীম স্নেহই যে তাহার সমস্ত জীবনটী ভরিয়া রাখিয়াছে। পিতার ভালবাসাই যে তাহার জীবনের সম্বল! পিতাকে ছাড়িয়া একা সে কিরূপে থাকিবে!

পিতা-পুত্র উভয়েরই যখন মনের ভাব এইরূপ, তখন কাজেই সুধীরের পড়িবার ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিক দিন তাহার এ অবস্থায় গেল না। পিতা-পুত্র উভয়েরই যুক্তি-তর্ক খণ্ডিত হইয়া গেল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সুধীরকে একাকীই কলিকাতায় যাইতে হইল। হরনাথবাবুর জনৈক প্রতিবেশীর পুত্র কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। সে আসিয়া একদিন হরনাথবাবুকে বলিল, "আপনি স্নেহের আধিক্যে সুধীরের ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্ব্বেন না। সুধীরকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন্; আমাদের সঙ্গে আমাদের 'মেসে' থাক্‌বে; আমি তাকে দেখ্‌ব। আপনার কোনো ভাবনা নেই। আপনিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আস্‌বেন। তা ছাড়া বছরে দু'বার 'কলেজ' বন্ধ হবে। পূজার বন্ধে, গ্রীষ্মের বন্ধে সুধীর দেশে আস্‌বে। আপনার ভাবনা কিসের? এমন ছেলে যদি এই পল্লী-গ্রামে বসে থাকে, ওর ভবিষ্যতে উন্নতির আশা একবারে মাটী হয়ে যাবে।" অগত্যা হরনাথবাবু সম্মত হইলেন।

যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। পিতার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া যথাসময়ে সুধীর উক্ত প্রতিবেশীর সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিল। পুত্রগতপ্রাণ হরনাথবাবু সুধীরের মুখ-চুম্বন করিয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলেন। হায়, এ হৃদয়নিধিকে মুহূর্ত্তের জন্যও চক্ষের অন্তরাল করিতে যে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, বুক চিরিয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া রাখেন। এই দুঃখময় জগতে অপত্যস্নেহ কি একটী স্বর্গীয় পদার্থ! ইহা নন্দনের পারিজাত, চন্দ্রের সুধা, সংসার-পীড়া উপশমের ধন্বন্তরি-হস্ত-নিঃসৃত অমোঘ ঔষধ। সন্তানের ন্যায় প্রিয় বস্তু এ সংসারে আর কিছুই নাই। বারংবার প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিবার আদেশ দিয়া, হরনাথবাবু সুধীরকে বিদায় দিলেন। সুধীর সম্মতি-সূচক মস্তক সঞ্চালিত করিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে গমন করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রকে দৃষ্ট হইল, হরনাথবাবু ততক্ষণ একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন সুধীর অদৃশ্য হইয়া গেল, তখনও তিনি তেমনই ভাবে চাহিয়া রহিলেন! ভাবিলেন, ঐ বুঝি, গাছের ফাঁক দিয়া ঝোপের আড়াল হইতে পুত্রকে অস্পষ্ট একটু দেখা যাইতেছে! ঐ বুঝি, তাহার পরিধেয় বসনের কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে! ঐ-ঐ বুঝি ওটা তাহার ছায়া!—না না, ও যে একটা গাছের ছায়া! সন্তানবৎসল উদ্‌ভ্রান্ত পিতা সংজ্ঞাশূন্য, নির্ব্বাক্, নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার ধরণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; প্রকৃতিরাণী ধূসর-বসনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করিলেন,—আর কিছুই দৃষ্ট হইল না! তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে হরনাথবাবু গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

তৃতীয় দিনে অতিপ্রত্যূষে উঠিয়া হরনাথ-বাবু ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন। তখনও ডাকঘর খোলা হয় নাই। ৮টার সময় ডাক বিলি হয়। যথাসময়ে 'পোষ্ট মাষ্টার'-বাবু আফিস গৃহে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হরনাথবাবু ব্যগ্রভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়! আমার কোনো চিঠী আছে কি?" 'পোষ্ট-মাষ্টার' বাবু হরনাথেরই গ্রামবাসী এবং বিশেষ পরিচিত। তিনি হরনাথবাবুর সকল কথাই জ্ঞাত ছিলেন। কস্মিন্ কালেও হরনাথবাবু ডাকঘরে আসিয়া চিঠীর জন্য তাগাদা করেন না। সুধীর কলিকাতায় গিয়াছে, সেইজন্যই যে হরনাথবাবু চিঠির সন্ধানে আসিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনার ত কোন চিঠি নেই! বোধ হয়, আপনি সুধীরের খবরের জন্য ব্যস্ত হয়ে-ছেন। কিন্তু সে ত মোটে পরশু কল্‌কাতায় গেছে, এখনও তার চিঠী আস্‌বার সময় হয় নি। হয়ত, কাল আপনার চিঠি আস্‌তে পারে।" হরনাথবাবু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি যে নেহাৎই নির্ব্বোধের মত কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বুঝিলেন ও লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে একবার ডাক-ঘরে আসা তাঁহার একটা দৈনিক কার্য্যের মধ্যে দাঁড়াইল।

সুধীর কলিকাতায় পৌঁছিয়া পিতার

প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিত। ইংরাজ-রাজের কৃপায় প্রবাসগত আত্মীয়ের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের ইহা একটি মহা সুযোগ। ডাকঘর তাহাদের পক্ষে মহাতীর্থ-ক্ষেত্র। সন্তপ্ত হৃদয়ের শান্তি-প্রস্রবণ!

(৬)

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে সুধীরের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে আজন্ম পিতৃস্নেহে লালিত, পক্ষি-শাবকের ন্যায় পিতার স্নেহময় বক্ষে বর্দ্ধিত! পিতার সে স্নেহনীড় ছাড়িয়া অন্যত্র বাস তাহার পক্ষে যে কষ্টকর হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে জীবনে এক দিনও পিতার অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করে নাই, প্রবাসে একাকী সে কি প্রকারে স্থির থাকিবে? এখানে ত সে 'কলেজ' হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্নেহময় জনকের দর্শন পায় না! কেহ ত তাহার জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথ-পানে চাহিয়া থাকে না! পাঠ্য পুস্তকগুলি অযত্নে অবিন্যস্ত ভাবে শয্যার চতুঃপার্শ্বে পতিত থাকে, কেহ সেগুলি যত্ন করিয়া গুছাইয়া রাখে না! পাঠের সময় একখানি পবিত্র আনন আনন্দ-গদ্‌গদ চিত্তে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে না! এ যে আত্মীয়-বন্ধু-বিহীন প্রবাস!—এ যেন পথিকের পান্থশালায় অবস্থানের ন্যায় তাঁহার অনুভব হইত। ঘটিকা-যন্ত্রচালিত হইয়া স্নান কর—খাও; কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে আর আহার মিলিবে না। আহার্য্য দ্রব্যই বা কি পরিপাটী! ফেন-মিশ্রিত দাল, ঘোষা সংযুক্ত পাড়া-আলুর তরকারি, "জলবৎতরলং" র ঝোল! কোথায় পিতার স্বহস্ত-প্রস্তুত সেই সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন, আর কোথায় এই উড়িষ্যা-দেশবাসী পাচকের কদর্য্য রন্ধন! পল্লী-বালক সুধীরের হঠাৎ এতটা পরিবর্ত্তন নিরুদ্বেগে সহ্য করা কিছু কষ্টকর হইল। কলিকাতা সহরের এ বদ্ধ জলবায়ুও তাহার বড় ভাল লাগিত না। কলিকাতা-বাসিগণ "পাড়া গেঁয়ে" বলিয়া পল্লীবাসীদিগের উদ্দেশ্যে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পল্লীবাসিগণ প্রকৃতি-রাজ্যের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পান, সহরবাসিগণের অদৃষ্টে সে সুখভোগ ঘটিয়া উঠে না। নির্ম্মল বাতাস, তটিনীর মধুর কল্লোলধ্বনি, পক্ষীর গান, চন্দ্রের কিরণ, এমন আর কোথায়! কলিকাতা-সহরে এমন কি অনেক গৃহস্থের অদৃষ্টে সূর্য্যদেবের দর্শনলাভও ঘটিয়া উঠে না। সুধীর প্রকৃতি-রাজ্যের প্রজা। তাই তাহার এ 'ইলেক্‌ট্রিকে'র আলো, ইলেক্‌ট্রিকের বাতাস, কলের জল, কিছুই ভাল লাগিত না। তাহার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদা সেই মধুমতী-তীরের গৃহকুলে পড়িয়া থাকিত।

কলিকাতায় আসিয়া সুধীরের একটী সঙ্গী জুটিয়াছিল। অতুল-নামক একটী বালকের সহিত তাহার অত্যন্ত সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। অতুল সুধীরেরই সমবয়স্ক, এবং এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। অতুলের বাটী সুধীরদের মেসের ঠিক্ সম্মুখেই। সুধীর সর্ব্বদাই অতুলের বাটী যাইত। অতুলের মাতাও সুধীরকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অতুলের ছোট বোন্ বিভা সুধীরকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করিত। বালিকার সেই অকপট অনাবিল ভালবাসা সুধীরকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সুধীরের ভ্রাতা-ভগ্নী ছিল

না। ভ্রাতৃপ্রেম তরীর স্নেহে সে চির-বঞ্চিত ছিল। বালিকা বিভাকে তাই তাহার বড়ই ভাল লাগিত। সরলা বালিকার প্রাণে কুটিলতার স্থান ছিল না। সংসারের ভেদাভেদ-জ্ঞান তাহার জন্মে নাই; —আপন-পর সে জানিত না; শুধু জানিত প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে। সুধীরকে দেখিলেই সে "সুধীর-দা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিত, কখনও হাত ধরিয়া টানিয়া মাতার নিকটে লইয়া যাইত। আবার কখনও বা ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া বলিত সুধীর-দা, খোকাকে আমার পিঠে চড়িয়ে দিন্ না, আমি ঘোড়া হব! বালিকার বাসনা শুনিয়া সুধীর "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিত। বাস্তবিক এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইয়া সুধীরের মন অনেকটা ভাল ছিল। সুধীরের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে বিভা বড় ভাল বাসিত। সুধীর ও বিভাকে বড় ভাল বাসিত। মধ্যে মধ্যে পুতুলটী, ছবির বইখানি, জরির ফিতা প্রভৃতি কিনিয়া সুধীর বিভাকে প্রীতি উপহার দিত। বিভা তাহা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রত্যেককে দেখাইয়া বেড়াইত। এই-রূপে সুখে দুঃখে সুধীরের প্রবাসের দিন-গুলি এক রকম কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একবার গ্রীষ্মাবকাশ কালে অতুল সুধী-রের সঙ্গে সুধীরের বাটী গিয়াছিল। অতুল কলিকাতা-বাসী, জীবনে সে কলিকাতা ভিন্ন অন্য দেশ দর্শন করে নাই। কমলাপুর তাহার নিকটে বড় সুন্দর মনে হইল। উষার অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া নব দিবাকর, যখন পূর্ব্বাকাশে দেখা দিতেন, তখন নদী-তীরে দাঁড়াইয়া অতুল বিমুগ্ধ নেত্রে তাহা দর্শন করিত। আবার দিবসের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সূর্য্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করিতেন, সুধাকর গাছের আড়াল হইতে সহাস্য আস্যে উঁকি দিতেন, এক দিকে কমলিনী বিষণ্ণ চিত্তে আপনাকে সঙ্কুচিত করিত, ও অপর দিকে কুমুদিনী পতি-দর্শন লালসায় সহর্ষ চিত্তে প্রস্ফুটিত হইত, তখন অতুল তাহা দেখিয়া পুলকিত হইত। তটিনীর মৃদু কল্লোল, কোকিলের কূজন, বিহঙ্গের কাকলী, অতুলের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। অতুল মনে মনে বলিত, "কে বলে পল্লীগ্রাম খারাপ? আমি যদি এমন গ্রামে বাস করতে পেতুম, তাহলে জীবন সার্থক মনে কর্‌তুম। কি পবিত্র শান্তিপূর্ণ এই দেশ! কি সুন্দর! এ যে বঙ্গমাতার বিশ্রাম-কুঞ্জ! জনপূর্ণ নর-কোলাহল-মুখরিত সহর অপেক্ষা এ শুদ্ধ পল্লী নির্জ্জন নীরব সাধকের মনোমুগ্ধকর কবিত্বে পরিপূর্ণ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

অনুতাপ।

যখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,
　　সারা নিশি জেগে তোমার আশে,
তখন তুমি এসেছিলে, নাথ,
　　মাথাটীকে ফেলে গেছ পাশে!

ডেকে ডেকে পাও নি তুমি সাড়া,
　　ফিরে গেছ অভিমান ভরে;
ভেবেছিলে কোনো আয়োজন!
　　করি নাইআমি তোমা তরে!

ভাবছি আমি কতদিন ধ'রে,
বঞ্চিত না হব মরণনে।
এমন ক'রে যাবে তুমি চ'লে
ভাবি নাই কোনো দিন মনে।
সযতনে রচি' আসনখানি,
বসেছিলাম, কত আশা ক'রে,
তার উপরে বসবে যবে তুমি,
দেখবো আমি দু'টী নয়ন ভ'রে!

বনে বনে কুড়িয়েছিলাম ফুল,
পূজবো ব'লে তোমায় কত সাধে।
এসেছিলে যদি, নাথ, তুমি,
জাগালে না কোন্ অপরাধে?
আর আমি ঘুমাবো না কভু,
ফিরে এস ওগো মোর সখা,
একা আমি ভাবছি বসে ব'সে,
আবার কবে পাব তব দেখা!

শ্রীউমাচরণ ভট্টোপাধ্যায়।

সংবাদ।

কংগ্রেসের প্রার্থনা—আগামী জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ভারত-সচিব মহাশয়কে বড়দিনের সময় কলিকাতার কংগ্রেস দর্শন করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভারত-সচিব মহাশয় তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন যে, বড়দিনের সময় তাঁহার কলিকাতায় থাকা অসম্ভব।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান মন্দির—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতির যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন, জগতে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ঐ তত্ত্বের আরও অনুশীলন করিবার জন্য তিনি এক মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, মন্দিরের মধ্যে যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুশীলন হইবে, মন্দিরের পশ্চাতে নির্জ্জন সুরম্যস্থানে সাধক আরও বৈজ্ঞানিক আলোক লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন। স্যার জগদীশচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এই মন্দিরের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ১৫ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই সংবাদ অবগত হইয়া, ভারতের জ্ঞান জগতে বিলাইবার অভিলাষে বোম্বায়ের বোমানজী একলক্ষ ও মিঃ মুলজি খাটাও সওয়া দুইলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও ডাক্তার বসুর শিষ্যদিগের জন্য ৬টী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় মহিলা-বৃত্তি।

এ বৎসর নিম্নলিখিত বালিকাগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

২০৲ টাকার বৃত্তি।

সুধা দত্ত—মহারাণী হাইস্কুল দার্জ্জিলিং।

১৫৲ টাকার বৃত্তি।

১। সুবোধবালা রায়—বেথুন।
২। নিখিলবালা গুপ্ত—ইডেন হাইস্কুল, ঢাকা
৩। প্রীতিলতা গুহমল্লিক—ব্রাহ্ম গার্লস।
৪। ইন্দুবালা দাসগুপ্ত—ইডেন, ঢাকা।
৫। লীলাবতী নাগ— „ „ „
৬। সুধা চট্টোপাধ্যায়—বেথুন।

১০৲ টাকার বৃত্তি।

১। অমিয়প্রভা বিশ্বাস—বিদ্যাময়ী,ময়মনসিংহ।
২। লীলা বসু—ডাওসেসন।
৩। মালতীমালা সরকার, ইউনাইটেড মিশন।
৪। স্নেহপ্রভা সরকার—বিদ্যাময়ী ময়মনসিংহ
৫। ফুলবালা গুপ্ত—ব্রাহ্ম গার্লস।
৬। সুধীরবালা গুপ্ত— „ „
৭। সুমতিবালা দাস—ইডেন, ঢাকা।
৮। মণিকা চাটার্জ্জি—বেথুন।
৯। সুনীতিবালা রায়—বিদ্যাময়ী,ময়মনসিংহ।

মিঃ টমাসক্লার্ক পিলিং গিবন্স কে, সি, ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গালার 'এড্‌ভোকেট জেনারেল'-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 652. December, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫২ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ডিসেম্বর, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্রদেশ—একতালা।

ঐ মহাসিন্ধুর ও-পার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে, "আয় চলে আয়,
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে!"
বলে, "আয় রে ছুটে, আয় রে ত্বরা,
হেথা নাইকো মৃত্যু, নাইকো জ্বরা,
হেথায় বাতাস গীতি-গন্ধ-ভরা, চির-স্নিগ্ধ মধু-মাসে;
হেথায় চির-শ্যামল বসুন্ধরা, চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে?
দেখ্ ঐ সুধা-সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ-ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ,
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ?
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে আছিস্ পরবাসে!"

কথা ও সুর—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

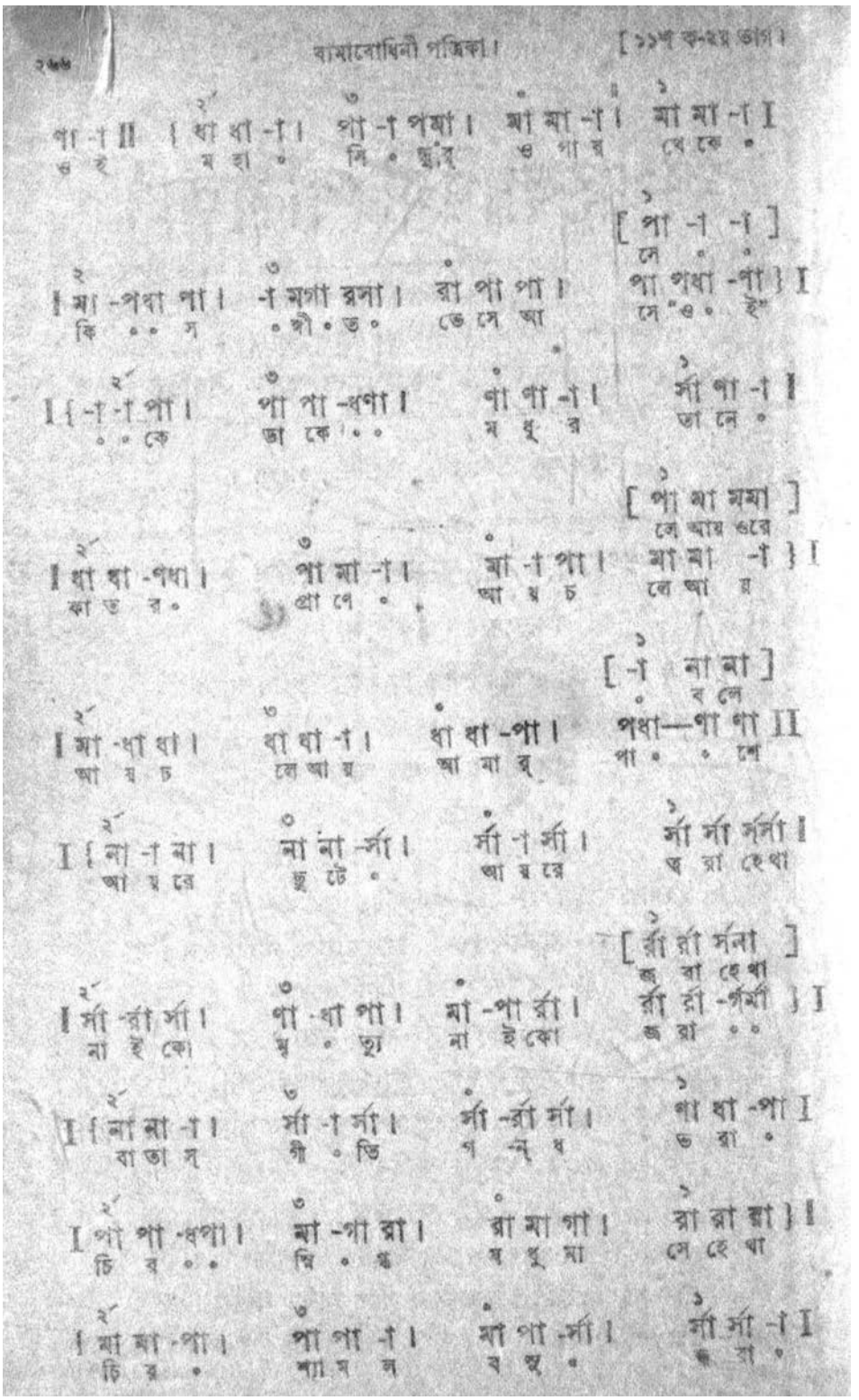
পা -া ॥ (ধা ধা -া। পা -া পমা। মা মা -া। মা মা -া ।
ও হে ম হা ০ পি ০ ঙ্গার ও পা র খে কে ০
[পা -া -া]
সে ০ ০
। মা -পধা পা। -া মগা রসা। রা পা পা। পা পধা -পা) ।
কি ০০ স ০ গী ০ ত ০ ভে সে আ সে ও ০ ই
। (-া -া পা। পা পা -ধপা। পা পা -া। র্সা পা -া ।
০ ০ কে ভা কে ০০ ম ধু র ভা নে ০
[পা ধা মমা]
সে আয় ওরে
। ধা ধা -পধা। পা মা -া। মা -া পা। মা মা -া) ।
কা ত র ০ প্রা ণে ০ আ য় চ লে আ য়
[-া না না]
ব লে
। মা -ধা ধা। ধা ধা -া। ধা ধা -পা। পধা—পা পা ॥
আ য় চ লে আ য় আ মা র্ পা ০ ০ শে
। (না -া মা। না না -র্সা। র্সা -া র্সা। র্সা র্সা র্সা ।
আ য় রে ছু টে ০ আ য় রে ত রা হে থা
[র্রা র্রা র্সনা]
জু রা হে থা
। র্সা -র্রা র্সা। পা -ধা পা। মা -পা র্রা। র্রা র্রা -র্গর্মা) ।
না ই কো ম ০ ত্য না ই কো জ রা ০ ০
। (না না -া। র্সা -া র্সা। র্সা -র্রা র্সা। পা ধা -পা ।
বা তা স গী ০ ভি ণ -নি ধ ভ রা ০
। পা পা -ধপা। মা -পা রা। রা মা গা। রা রা রা) ।
চি র ০ ০ মি ০ ত্র ম ধু মা সে হে থা
। মা মা -পা। পা পা -া। মা পা -র্সা। র্সা র্সা -া ।
চি র ০ শ্যা ম ল ব স্থ ০ জ রা ০

[-া সা সা]
০ কে ন

I ২ র্রা -র্সা -পা। ৩ ধা -পা পা। ০ পা ধা -া। ১ পা -ধপা পা II
চি র ০　　জ্যো ৎ স্না　　নী লা ০　　কা ০ ০ শে

I ২ রা রা -া। ৩ রা রা -গমপা। ০ রা রা -া। ১ রা রা রসনা I
ভূ তে র　　বো ঝা ০ ০ ০　　ব হি ন্　　পি ছে ভূতের

I ২ মা মা -া। ৩ মা মা -া। ০ মা মা -পধা। ১ পা মা মমমা I
বে গা র　　খে টে ০　　ম রি স্ ০　　মি ছে দেখ্ ঐ

I ২ { ধা ধা -া। ৩ ধা -া ধা। ০ ধা পা ধা। ১ পা -া -া I
হ ধা ০　　সি ০ স্কু　　উ ছ লি　　ছে ০ ০

[ধা র্সা র্সর্সা]
শে ভূ তের
I ২ পা -ধা পা। ৩ মা -া পা। ০ মা ধা পা। ধা ধপা -র্সা) I
পূ ০ র্ণ　　ই ০ স্কু　　প র কা　　শে দেখ্ ঐ

I ২ র্সা সা -া। ৩ র্সা র্সা -া। ০ পা পপা -া। ১ ধা ধা -া।
বো ঝা ০　　কে লে ০　　ঘ রের্ ০　　ছে লে ০

[-া না না]
০ কে ন
I ২ পা ধা পা। ৩ মা পা -া। ০ মা ধা -া। পধা -পা পা II
আ র চ　　লে আ য়　　আ মা র　　পা০ ০ শে

I ২ { না না -া। ৩ না না -র্সা। ০ র্সা র্সা -া। ১ র্সা র্সা র্সর্সা I
কা রা ০　　গৃ হে ০　　আ ছি ন্　　ব দ্ধ ও রে

[র্রা র্রা র্সনা]
অ দ্ধ ও রে
I ২ র্সর্রা র্সা -পা। ৩ ধা পা -ধপা। ০ মা পা -র্রা। র্রা র্রা -র্গর্মা) I
ও রে ০　　মু চ ০ ০　　ও রে ০　　অ দ্ধ ০ ০

I ২ { না না -া। ৩ র্সা -া র্সা। ০ র্সর্রা র্সা -পা। ১ ধা -পা পা I
সে ই ০　　সে ০ প　　ব মা ০　　ন ০ ন

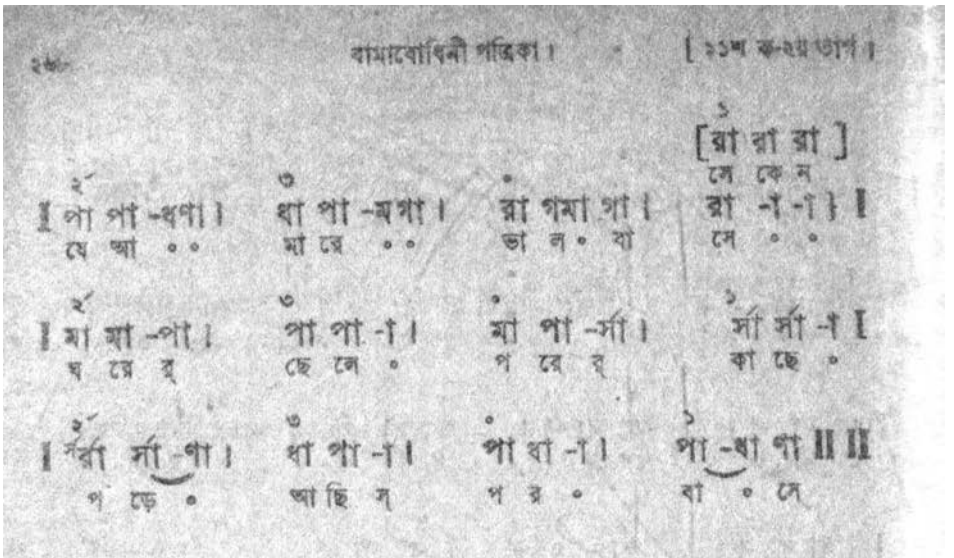

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৯)

বাড়ীর দুয়ারের কাছে আসিয়া নমিতা শঙ্কর-চাকরকে ডাকাডাকি করিয়া সাড়া পাইল না। সুরসুন্দর বৃদ্ধকে পথে হাঁড় করাইয়া, বারাণ্ডায় উঠিয়া, সজোরে কড়া নাড়িয়া প্রাণপণে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বিমল-বাবু, বিমলবাবু!—সুশীলবাবু,—!" এবার সুশীলের সাড়া পাওয়া গেল। তাহারা দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিতেছে.....।

সুরসুন্দর বারাণ্ডা হইতে নামিবার উদ্যোগ করিল। সে জুতার ফিতা-টা টানিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হেঁট-মুখে বলিল, "তা হ'লে আমি এখন চল্লুম্। কাল সকালে গাড়ে ছ'টায় সমুদ্রপ্রসাদ আস্‌বে। আপ্‌নি নিজে দেখে শুনে, একটু সাবধানে 'ড্রেস্' করিয়ে নেবেন্; ঘা-টায় পূঁজ যেন না হ'তে পায়, লক্ষ্য রাখ্‌বেন্।"

হিতলালবাবুর সৌহার্দ্দ্য ও আপ্যায়নের দৌরাত্ম্যে নমিতার মগজের মধ্যে বেশ একটু উৎকট গোল্‌মাল্ বাঁধিয়া গিয়াছিল। এত-ক্ষণের পর বাড়ীর দুয়ারে পৌঁছিয়া, সে যেন প্রকৃতিস্থ হইবার অবসর পাইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, প্রসন্ন-সৌজন্যপূর্ণ মুখে ছোট একটি নমস্কার করিয়া বলিল, "আসুন, আজ আমার জন্যে আপ্‌নারা বড়ই কষ্ট পেয়েছেন; —বিশেষ আপনি.....! বাস্তবিক, আমার বড় ভাই এখানে থাক্‌লে, আজকের বিপদে যা' না কর্‌তে পার্‌তেন্, আপ্‌নি তা'র চেয়ে বেশী করেছেন।—শুধু দূর থেকে পরের মত নমস্কার করা-টা আজ উচিত হয় না। আপ্‌নাকে প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নেওয়া-ই—!"

সহসা পিছু হটিয়া অস্বাভাবিক তীব্র গম্ভীর স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "না না, পরকে 'পর'

বলেই মনে রাখ্‌বেন! ও-সব লৌকিকতার আড়ম্বর—সমস্তই—সব একেবারে ভুলে যান্—ভুলে যান্! সংসারের মাঝ্‌খানে দাঁড়িয়ে, শিষ্টসৌজন্য-কোমলতার অনুরোধে, ও-সব হাস্যাস্পদ পাগ্‌লামীকে মনে ঠাঁই দেবেন না; আমি বারণ করে দিচ্ছি। কে বল্‌তে পারে, শেষে হয় ত একদিন স্রেফ্ ঐ জন্যেই .....?" সুরসুন্দর আর বলিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

অন্ধকারে বিস্ময়াহত নমিতার পাণ্ডু বিবর্ণ মুখ-ভাব কেহ দেখিতে পাইল না; কিন্তু তাহার স্বচ্ছন্দ-নিঃশ্বাস-গতিটা যে, অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল! নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া সুরসুন্দর বেদনা-মথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বড় অশোভন স্পর্দ্ধা-বর্ব্বরতা প্রকাশ কর্‌লুম কি? কি কোর্ব্বো! ক্ষমা করুন্; উপায় নাই! আমাদের চক্ষে যে, সৌজন্য, শীলতা, শিষ্টতা, কিছুই নাই; আছে শুধু, কুৎসা, গ্লানি, আর বীভৎস নীচাশয়তা! আমাদের আত্মপর কোনো সম্মান-জ্ঞানই নাই; তাই যথেচ্ছ-কৌতুক-প্রিয়তার পরিচয় দেবার জন্য আমরা অতিব্যগ্র। কিন্তু শ্লীলতার সীমা কোথায়, সেটুকুর হিসাবে আমরা অতিকুণ্ঠিত! আমাদের মত জানোয়ারের কাছে মানুষের শিষ্টতা জানাতে আসেন্? ভুল, বিষম ভুল! ম্যাডাম্, যে রাস্তার, যে ধুলোর উপর ভগবান্ আপ্‌নাকে দাঁড় করিয়েছেন, সে রাস্তার, সে ধুলোর উপর নারীজনসুলভ হৃদয়ের নমনীয়-কোমলতা নিয়ে দাঁড়াবার স্থান নাই! প্রাণকে পাথরের মত শক্ত করুন্, তবে এখানে দাঁড়াবার শক্তি পাবেন। না হ'লে, ঠক্‌বেন,—বড় মর্ম্মান্তিক ঠকা ঠক্‌বেন্! এটা নিশ্চয়!—"

ভিতরের উগ্র-উত্তেজনার তাড়নে সুর-সুন্দরের আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না; ধূলি-ধূসরিত বারাণ্ডার সিঁড়ির উপরে বসিয়া পড়িল ও ঘাড় হেঁট করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ সবলে দমন করিয়া নিঃশব্দে চক্ষের জল সাম্‌লাইয়া লইল। গভীর অভিমান-বেদনাহত স্বরে সে বলিল, "কোন্ সাহসে মুখ উঁচু করে বিশ্বাস-যোগ্যতার দাবী কোর্‌বো বলুন! সে স্থান নাই! চারিদিকে যে বীভৎস পঙ্কিলতার স্রোত বয়ে যাচ্ছে! এতে কি জঘন্য গ্লানিতে মন ভরে যায় না, লজ্জায় ঘৃণায় মুখ পুড়ে যায় না? আপ্‌নি ছেলেমানুষ; এ-সবের কি বল্‌বো আপনাকে? তবে একটি কথা বলে রাখ্‌ছি—।" এই বলিয়া সুরসুন্দর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কঠিন স্বরে বলিল, "আমাদের হৃদয়হীন লঘু চপলতা, নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতার সংস্রব থেকে, যতটা পারেন, দূরে—খুব দূরে সরে দাঁড়ান! পৃথিবীর বাজারে উচ্চ-প্রাণতা বলে কোন জিনিস নাই; তাই মানুষের হৃদয়ের নির্ম্মল বিশ্বাস-প্রীতি, শ্রদ্ধা-সম্মান,—এ সকল আমাদের কাছে মূল্যহীন,—নাটক-নবেলের কথা মাত্র! তাই শ্রদ্ধামর্য্যাদাহীন নীচাশয়করণ আমরা। আমাদের অসাধ্য হেয় কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই! এটা খুব ভাল করে স্মরণ রাখ্‌বেন।

দ্বার খুলিয়া সুশীলের সহিত লছ্‌মীর মা আলো হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। মুখের

ঘাম হেঁটে হইয়া হাঁটুর কাপড়ে মুছিয়া, শুষ্ক স্বরে সুরসুন্দর বলিল, "যান্, বাড়ীর ভেতর যান্।" তাহার পর পথে নামিয়া, কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে আবার বলিল, "কাল সকালেই সমুদ্র আস্‌বে, মনে রাখ্‌বেন।..... তা হ'লে আসি।—যান্, দাঁড়াবেন না; বাড়ী যান্। সুশীল, বাড়ী যাও ভাই!"

সুশীলের সৌজন্য-জ্ঞানটা খুব তীক্ষ্ণ; সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এই যে যাই; আগে আপ্‌নারা চলে যান্; তা'পর।"

সুরসুন্দর শান্ত কোমল দৃষ্টিতে সুশীলের পানে চাহিয়া ম্লানভাবে একটু হাসিল। তারপর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বৃদ্ধের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। নমিতা কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিঃশব্দ পাদক্ষেপে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর দৃষ্টি-পথাতীত হইলে, দুয়ার বন্ধ করিয়া লছ্‌মীর মা'র সহিত সুশীল বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে লছ্‌মা রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ইহার পর ধীরে সুস্থে নমিতার হাতের সংবাদটা সময় মত জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে বলিয়া, আপাততঃ কাজ কামাই করিতে তাহার ত্বরা সহিল না। কর্ম্মঠ-প্রকৃতি লছ্‌মীর মা চিরদিনই হাতের কাজ সারিয়া, তবে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সংবাদ লইত।

সুশীল মা'র ঘরে এক দৌড়ে আসিয়া দিদির সন্ধান লইয়া জানিল, সেখানে দিদি এখনও পৌঁছায় নাই। তৎক্ষণাৎ সে দিদির শয়নকক্ষের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

বিমলের পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়া শয়নকক্ষে যাইতে হয়। ছুটিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে ঢুকিয়াই সুশীল হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, টেবিলের কাছে চেয়ারের পিছনে পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে দাঁড়াইয়া, নমিতা অস্বাভাবিক ব্যাকুল-দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান স্বর্গীয় পিতৃদেবের 'ফটো'-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডলে নিরুপায়-নির্য্যাতনবাহী শুষ্ক-গাম্ভীর্য্যের দীপ্ত জ্বালা উদ্ভাসিত!

এক রাশ প্রশ্নের বোঝা সুশীলের জিহ্বার মধ্যে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গেল! নমিতাকে ডাকিতে তাহার সাহস হইল না। হাঁ করিয়া খানিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিল ও ঝুঁকিয়া পড়িয়া নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতটার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সন্তর্পণে 'ব্যাণ্ডেজের' এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে অঙ্গুলি-স্পর্শ করিয়া, আপন মনেই সহানুভূতি-করুণকণ্ঠে বলিল,—"আহা!"

সশব্দে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নমিতা মুখ ফিরাইয়া চাহিল। অব্যক্ত গ্লানি-মনস্তাপের উগ্রদ্বন্দ্ব বক্ষের মধ্যে তীব্র আলোড়নে চলিতেছিল; তাহারই ঘূর্ণিচক্রে সমস্ত অনুভূতিটা এতক্ষণ যেন হতজ্ঞান হইয়াছিল। সুশীলের আগমন-ব্যাপারটা মোটেই সে টের পায় নাই। একাগ্র-পর্য্যবেক্ষণে রত সুশীলকে নতশিরে পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সহসা সে চমকাইয়া গেল! আত্মসংবরণ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—"কে? সুশীল!"

"হুঁ" বলিয়া, বড় বড় চোখের আগ্রহোজ্জ্বল দৃষ্টি নমিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া সুশীল বলিল, "আমি ভেবেছিলাম বুঝি, তুমি আগেই মা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছ!

কাপড় ছাড়তে এসেছ, তা ত জানি নে! মা যে তোমার জন্যে বড্ডই ভাব্‌ছেন, দিদি!"

তাহার জন্য ভাবনা!—ধ্বক্ করিয়া রূঢ় বেদনার আঘাতে হৃৎপিণ্ডটা সজোরে নমিতার বুকের মধ্যে লাফাইয়া উঠিল। 'মা তাহার জন্য অত্যন্তই ভাবিয়া থাকেন—!' ইহা ত অত্যন্ত পুরাতন কথা! শুনিয়া শুনিয়া তাহার ত ইহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে! কিন্তু আজ?.....না, না, এই পুরাতন অভ্যস্ত সত্যের আস্বাদ আজ অত্যন্ত নূতন! সমস্ত অন্তঃকরণটা আজ নিদারুণ অভিমান-ক্ষোভে অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে! তাহার জন্য ভাবনা!' সত্যই তাহার অবস্থা আজকাল অসহনীয় সমস্যা-সঙ্কটে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার জন্য সকলেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তান্বিত! যাহার ভাবিবার কথা নয়, তিনিও!

মুখ ফিরাইয়া নমিতা তীব্রদৃষ্টিতে নিজের দেহের পানে চাহিল! একটা হিংস্র উন্মাদনায় মনটা মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর উগ্র হইয়া উঠিল! এই দেহটার জন্যই না? হাঁ, সকল দিকেই অন্ন-বাসস্ত্রের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া, দেহযাত্রাটা বেশ স্বচ্ছলভাবে সে নির্ব্বাহ-করিতেছে, কিন্তু জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে! শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাধীন স্বচ্ছন্দতাও যে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! সংসারের যত কিছু জঘন্য-লালসার ক্রূরদৃষ্টির সাম্‌নে শুধু এইটার অপরাধেই ভয়-কুণ্ঠিত হইয়া চলিতে হয় না? হাঁ, শুধু এই জন্যই! কঠিন হস্তে কণ্ঠনালী টিপিয়া ধরিয়া বিকৃতকণ্ঠে নমিতা বলিল, "বেরিয়ে যা, সুশীল—!"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীল বলিল, "তুমি কাপড় ছাড়্‌বে?"

অকস্মাৎ উগ্র ঝাঁজের সহিত নমিতা বলিল, "হাঁ, হাঁ; তুই যা না—!"

বিস্মিত সুশীল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। চেয়ারের পিছনে বসিয়া পড়িয়া হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, আজ অনেক দিনের পর, নমিতা অসহ্য কষ্টে, আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল! তীব্র অভিমানাহত নিঃশব্দ ক্রন্দন!

নমিতা সংসার-জ্ঞানে অনভিজ্ঞা, নির্ব্বোধ, ছেলেমানুষ! হায়, সংসারের মানুষ, বাহিরে দাঁড়াইয়া দেহের বয়স হিসাব করিয়া কাহাকে বিচার করিতে চাহ! দুঃখ-দ্বন্দ্ব-শোকের তাড়া খাইয়া সচেতন অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষের মনের বয়স যে অত্যন্ত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে! দেহের বয়সের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সব মাটী মাড়াইয়া চলিবার সাধ্য ত তাহার থাকে না!.....কিন্তু হায়, কে ইহা বিশ্বাস করিবে? বিষয়ী বুদ্ধিমানেরা জানেন, ইহা নাট্যাচার্য্যের নাটকীয় বিজ্ঞতা, ঔপন্যাসিকের অলস-মস্তিষ্ক-প্রসূত ভৌতিক উপদ্রব!..... থাক্, যাহা ইচ্ছা তাঁহারা মনে করুন, ইহা লইয়া তর্ক চলিবে না!

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার আলোক-চিত্রের দিকে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি আবার বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গেল! ঐ পুণ্যোজ্জ্বল শোক-স্মৃতি! উহার প্রতিষ্ঠা-অর্চ্চনার স্থান সত্যই কি জগতে কোথাও নাই? জীবন্ত মানুষের সজাগ প্রাণের অভ্যন্তরেও নাই? ঐ সুমহান্ স্মৃতির তেজস্বী শক্তি-প্রেরণাবলে হৃদয়ের মধ্যে দৃপ্ত নির্ভীক হইয়া, শান্ত-নির্ম্মল দৃষ্টি

তুলিয়া, সে সমস্ত জগতের সকল নয়নে যে, ঐ পিতৃনয়নের উজ্জ্বল স্নেহ-করুণা দেখিতে চায়, ঐ পিতৃমুখের প্রতিবিম্ব-মহিমা দেখিতে চায়! সে সবই অলীক ভাবুকতা মাত্র! সত্যের লেশ তাহাতে কিছুই নাই! অসহ্য! এমন জঘন্য কৃতঘ্নতার—এমন নিষ্ঠুর বিশ্বাসহীনতার বেদনা বহিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; অন্ততঃ নমিতা পারিবে না।

সহসা একটা নূতন আশ্বাসের সুর আসিয়া তাহার অবসন্ন মনকে স্পর্শ করিল। শান্ত হইয়া নমিতা চক্ষের জল মুছিল। এই সময় বাহির হইতে সুশীল ডাকিল, "দিদি, এখনো তোমার হয় নি?" আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া নমিতা বলিল, "তুই, বুঝি আমার জন্যে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্? আচ্ছা, ঘরে আয়।"

ইতস্ততঃ করিয়া সুশীল বলিল, "না, তুমি কাপড় ছাড়; আমি মা'র কাছেই যাই—।"

নমিতা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "না না, এই খানেই আয় ভাই, একটা কথা বল্‌বো—।

সুশীল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি—?"

নমিতা আঁচলের কাপড়টা মুখের উপর উত্তমরূপে ঘসিয়া মাজিয়া, নিকটস্থ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। সুশীলকে পাশে টানিয়া লইয়া, ডানহাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্মিতমুখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সে বলিল, "স্থিথের কাছে ডাক্তার মিত্রের কথাটা বলা হয়েছে? একাও বোকা তুই!.....আচ্ছা; বল ত, বাড়ীতে মা'র কাছে এসেও সব গল্প করেছিস্?"

ঘাড় নাড়িয়া বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে সুশীল বলিল, "না দিদি, শুনে শুধু মার মনে দুঃখু হবে, তাই বলি নি,.....।"

উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নমিতা বলিল, "লক্ষ্মী ভাইটী আমার! মগজের বুদ্ধির সঙ্গে বিবেচনা একটু খাটিয়ে সাবধান হয়ে মা'র কাছে কথাবার্ত্তা বলো! শোকে-দুঃখে একেই তাঁর মন ভেঙ্গে রয়েছে, তার ওপর বাইরের ব্যাপার,—আমাদের দুঃখ, ক্ষতি অপমান, এ গুলোর ভার আর চাপান চলে না!... বাইরের বোঝা চৌকাটের বাইরে নামিয়ে রেখে, ঘরে তাঁর কাছে হাল্কা হয়ে এসে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছ মাণিক, তাঁর কাছে কিছু বলো না...।"

নমিতার বেদনা-করুণ কণ্ঠস্বরে সুশীলের চোখ্-দুইটা ছল্ ছল্ হইয়া আসিল। ম্লান মুখে সে বলিল, "কিন্তু তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার কথাটা ত বলে ফেলেছি—।"

মৃদু হাসিয়া নমিতা বলিল, "উত্তম, ওটা এড়িয়ে যাওয়া চল্‌ত না।"

সুশীল পুনশ্চ বলিল, "আমারই মাথায় ঠুকে যে তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে গেছে, তাও বলেছি।—তা'র জন্যে ছোড়্‌দি—।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে নমিতা বলিল, "থাক্ থাক্, বুঝেছি। ছোড়্‌দির কথা বাদ দিয়ে যা। চল মা'কে আগে দেখা আসি।"

সুশীল বলিল, "কাপড় ছাড়্‌বে না?"

"তিনি ভাবছেন্ যে, আগে তাঁকে খবরটা দিয়ে আসি—।" এই বলিয়া নমিতা বাহির হইল। সুশীলও তাহার পিছু পিছু চলিল।

বাহির হইতে বিমল আসিয়া সদর দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকাডাকি করিতেছে

শুনিয়া, সুশীল হুমার খুলিয়া দিতে ছুটিল। নমিতা একাকিনীই মা'র ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মা পিঠের কাছে উঁচু বালিশ রাখিয়া, অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতেছিলেন। নমিতা ঘরে ঢুকিতেই, উদ্বেগপূর্ণ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে তিনি বলিলেন, "হাতটায় কি বড়ই লেগেছে?"

প্রফুল্ল-স্মিত মুখে বেশ জোরের সহিত নমিতা বলিল, "কিছু না!—সামান্যই আঘাত!—"

নমিতা মাতার বুকে তৈল-মালিশ করিতেছিল। নমিতা তাহারই পাশে বসিয়া পড়িয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, 'কাণার লগ্নে কুঁজের বিয়ে';—মাঝ্‌খান থেকে আমি সাতদিনের ছুটি পেয়ে গেলুম।—এ একরকম মন্দ হোল না। যথালাভ.....।" এই বলিয়া নমিতা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল; যেন তাহার এই পরমলাভের সুসংবাদটুকু মাতার কাছে বহন করিয়া আনিতে পারায় আনন্দে সে পরম কৃতার্থতায় উল্লসিত!—কিন্তু অন্তর্যামী দেখিতেছিলেন, তাহার এই ছুটির লাভ-টা কিন্তু কঠোর-গ্লানি-বিষ-দগ্ধ! কি দুঃসহ-বেদনাময়! কি নিদারুণ অস্বস্তি-অভিশাপপূর্ণ!

স্নিগ্ধের স্নেহ-করুণার উল্লেখে খুব একটা বড় রকম ভূমিকা ফাঁদিয়া, নমিতা জাঁকাইয়া প্রশংসা সুরু করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সুশীলের সহিত বিমলকুমার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে ঢুকিল। নমিতার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা হাতের প্রতি ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল ক্ষুণ্ণভাবে বলিল—"ওঃ, কি গ্রহের ফের! দুঃখ-বিপদ্ যখন আসে, তখন এমনি করেই এসে থাকে! তোমার দরকারী কাজের হাতটা আজ্‌কা জখম্ হোল!"

বিমল বাম পায়ের গ্রন্থিটা সজোরে টিপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অন্ধকারে ছুটোছুটি করে যেতে থানায় পড়ে পা মচ্‌কে গেছে! তবু এই পা নিয়েই চারিদিক্ ঘুরলুম্; কেউ সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না, মা!···বাস্তবিক, লোকটা আশ্চর্য্য পালানই পালিয়েছে!..."

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "কে?"

সুশীলের দিকে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিমল বলিল, "গেজেট, কি নিতাকৃষ্ণ-পদ্ধতি ভুলে গেছিস্, না কি? ডাক্তারবাবুর ঠাকুর যে ফেরার···! শোন নি, দিদি?"

হতবুদ্ধি নমিতা বলিল, "কখন্?—"

বিমল বলিল, "সন্ধি ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে তাকে খবর দিয়েছিল যে, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তুমি দেখা কর্‌তে গেছ। সেই শুনেই সে বেচারী উদ্বেগ-চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তারপর তুমি গেছ, সুশীল গেছে, আমি 'বল্' খেল্‌তে বেরিয়ে গেছি; ইতিমধ্যে কখন্ সে গায়ের কাপড়খানি নিয়ে সুট্ করে নিঃশব্দে পিট্‌টান দিয়েছে; কেউ জানে না! আমি 'বল্' খেলে এসে ব্যাপার শুনে, তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলুম্; এই বাড়ী ঢুক্‌ছি!"

নমিতা গুম্ হইয়া খানিকক্ষণ ভাবিল। বিমল আহত পায়ের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বিরক্তভাবে বলিল, "যাই বল বাপু, পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, সুখশুদ্ধি ত ষোল আনা! আবার বদনামের ভাগী হওয়া

দ্যাখো। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কোথায় হয় ত ভেঁচ্‌কানি লেগে মরে পড়ে থাক্‌বে, তারপর সে পাপের দায়ী কে হ'বে বল ত? আর লোকটার নিমক-হারামি দ্যাখো! আমরা এত যে করলুম, তা একটা কৃতজ্ঞতা জানান নেই, কিছু নেই;—খাতির নদারত; বেমালুম গা-ঢাকা দিলে! কি বল্‌তে ইচ্ছে হয় বল দেখি?"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমিতা বলিল, "কৃতজ্ঞতার কাঙ্গালী হয়ে এখানে বসে মাথা খুঁড়্‌লে কোনই লাভ নেই। উঠে পড়, ভাই! চল দু'জনে মিলে রাস্তায় আর একটু খোঁজ্‌ তল্লাশ করে আসি। আমাদের কর্ত্তব্যটা আমরা পালন করে যাই; তারপর ভগবানের ইচ্ছা—!"

আহত চরণটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমল বলিল, "তুমি বল্‌ছ, চল যাই; কিন্তু কিছুই যে ফল হবে না, তা আগেই বলে রাখ্‌ছি। আর একটা কথা। সুরসুন্দর তেওয়ারীকে বলে এসেছি। তিনি এখনি চারিদিকে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নেবেন। ওঁর কাছে উপকার পায় বলে, অনেক হিন্দুস্থানী ওঁর বাধ্য আছে। সুরসুন্দর আরো বল্লেন, ঐ ঠাকুরের চাচা না কি হয় বটে, কে এক ভাই বেয়াদার কাছারিতে পেয়াদার কাজ করে। তা'র কাছে খোঁজ্‌ নিলে, খুব সম্ভব, সন্ধান পাওয়া যাবে।"

রুষ্টভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নমিতা বলিল, "তোর সবই ব্যাগার-ঠেলা কাজ! এখন থেকে এই রকম ফাঁকিবাজ্‌ হ'তে অভ্যাস কর্‌ছিস, এর পর বয়স বাড়্‌লে সংসারের কাজে একটা অদ্ভুত স্বার্থপর জন্তু হয়ে উঠ্‌বি, দেখ্‌ছি!"

নমিতা যে হঠাৎ এমন রাগিয়া উঠিবে, বিমল তাহা প্রত্যাশা করে নাই। একটু থতমত খাইয়া সে বলিল, "তেওয়ারী নিজেই খোঁজ্‌ নেওয়ার কথা তুল্লেন। হাঁসপাতালের বুড়ো মেথরকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মোড়ের কাছে দেখা হল; আমায় খোঁড়াতে দেখে তিনি বল্লেন, "আপ্‌নি আর কষ্ট কর্‌বেন না; বাড়ী যান্‌। আমি খবর নিয়ে পরে আপ্‌নাকে জানাব।" তা'রই কাছে ত তোমার হাতে ক্রুশ বিঁধে যাওয়ার খবর পেলুম।"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না। মনের মধ্যে যে অত্যুগ্র দ্বন্দ্ব-তিরস্কারের বিশৃঙ্খল তুফান-স্রোত বহিতেছিল, তাহার উদ্দাম চেউ সশব্দে তাহার উপরে আছড়াইয়া পড়িতে চায় দেখিয়া, নমিতা নিজের উপর বিরক্ত হইল। পাচকের পলায়ন-সংবাদের নীচে সব দুশ্চিন্তা ঢাকা পড়িয়াছিল। একটা উদ্বেগ-পীড়ন উপর্য্যুপরি ঝাপ্‌টা হানিয়া তাহাকে অশান্ত করিয়া তুলিতেছিল। পাচকের সাহায্যের জন্য ডাক্তার-পত্নী তাহাকে টাকা গণ্ডাইয়া দিয়াছেন;—সে-কথা মা'র কাছে বলা উচিত কি না?—সে-সমস্যা লইয়া নমিতা নিজের মধ্যেই অত্যন্ত বিপন্নতা অনুভব করিতেছিল। মা হয় ত ভিতরের দিকটা তলাইয়া বুঝিবেন না; বিরুদ্ধ ধারণায় অসম্মান-বোধে, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইবেন। কিন্তু ডাক্তার-পত্নীর সেই বেদনা-করুণ মুখচ্ছবি মনে পড়িলে, নমিতার মনের আত্মসম্মান-বোধটা যে নম্র অভিভূত হইয়া আসিতে চাহিতেছে, স্নেহ-সমবেদনায় প্রাণটা আর্দ্র হইতে চাহিতেছে! আহা, সেই নিরুপায় মর্ম্মপীড়িতা বেচারীর অনুতপ্ত হৃদয়-

ভার-লাঘবে সাহায্য করিতে পারিলে, নিজের সম্মান-ক্ষুণ্ণতার দুঃখ ভুলিয়াও নমিতা সত্যই সুখী হইতে পারিত। কিন্তু এ যে সকল দিকে গোল বাঁধিল! হায়! নমিতা গৃহে ফিরিবার আধ্ ঘণ্টা পরে যদি পাচকের মাথায় পলীয়নের সুবুদ্ধিটার উদয় হইত!

বিমলের কাছে আসিয়া আহত পায়ের এ-দিক্ ও-দিক্ টিপিয়া দেখিতে দেখিতে নমিতা বলিল, "মচ্‌কে ফুলে গেছে! একটু চুণে-হলুদ্ গরম কর্‌তে হবে—।"

আশ্বস্ত হইয়া বিমল তাড়াতাড়ি সমিতার দিকে চাহিল। বিমলের অভিপ্রায় বুঝিয়া মাতা বলিলেন, "সমি, যা মা, চুণে-হলুদের ব্যবস্থা দ্যাখ্। মালিশ থাক্—।"

সজোরে মালিশ করিতে করিতে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তির সুরে সমিতা বলিল, "এই এখুনি! দেখ্‌ছ এখন তেল মালিশ কর্‌ছি—।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তাই ত। না না, মালিশ চলুক্। আমি ওর পায়ের সদ্গতি কর্‌ছি; তুই মালিশ্‌টাই ততক্ষণ কর্। আমি এসে তোকে ছুটি দেব—।"

পরম সন্তোষে কৃতজ্ঞ ও উৎফুল্ল হইয়া সমিতা বলিল, "হ্যাঁ দিদি, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী তোমায় কেন ডেকেছিলেন?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নমিতা বলিল, "টাইয়ের নমুনার জন্যে। কাল বোনার বাক্সটা একবার পাড়্‌তে হবে। হাঁ, ভাল কথা! মা, আমাদের ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অক্ষয় সেনের পিস্‌তুতো বোন্। সেই অক্ষয়-দা—দাদার বন্ধু—।"

প্রবাসী 'দাদা'র সম্পর্কীয় প্রত্যেক সংবাদের প্রত্যেক বর্ণটির জন্য ভাই-বোনের চক্ষুকর্ণ সজাগ হইয়া থাকিত। সুতরাং তৎক্ষণাৎ অনেকগুলা আগ্রহ-ব্যস্ত প্রশ্ন উপর্য্যুপরি বর্ষিত হইয়া গেল। যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে-গুলার সন্তোষজনক উত্তর দিয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অতীত-সৌভাগ্য-দিনের অনেকগুলা বিস্মৃতপ্রায় স্নেহ-মধুর স্মৃতি সকলের মনের মধ্যে জাগিয়া একটা করুণ বেদনালোকের সৃষ্টি করিল।

আবশ্যক খুচ্‌রা কাজকর্ম্ম সব সারিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে নমিতা হাস্‌পাতালের দরখাস্ত লিখিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাকথা ভাবিয়া অনিলকে একখানি পত্র লিখিল।

পাছে অনিল দূরদেশে থাকিয়া বেশী দুশ্চিন্তায় পড়ে বা দুঃখিত হয় বলিয়া, নমিতা পারিবারিক ঘটনার বহির্ভূত সমস্ত সংবাদ যথাসম্ভব কাট্‌ছাঁট্ করিয়া তাহাকে জানাইত। অনিলও দূরে থাকিয়া একমাত্র স্ত্রিখের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও সংবাদ পাইত না। আজ নমিতা তাহাকে হাস্‌পাতাল-সংক্রান্ত সকল কথাই খুলিয়া লিখিল; আর ইহাও লিখিল যে, এরূপ সব উদ্ধতচেতা খাম-খেয়ালী প্রভুর মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইলে, ক্রমে নিজের ন্যায়ান্যায়-বোধ ও মনুষ্যত্ব-জ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া চলা ভিন্ন গতি নাই। কাজেই এখানে বেশি দিন টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলের উপর। কিন্তু মানুষকেও ঈশ্বর চেষ্টা ও চিন্তা করিবার শক্তি দিয়াছেন; সুতরাং, কুম্ভকর্ণের নিশ্চিন্ত-নিদ্রা-অবলম্বনে উদাসীন থাকা অনুচিত বিবেচনায় নমিতা অন্যত্র চেষ্টা দেখিতেছে। এখন অনিলের অনুমতি প্রার্থনীয়।

নমিতা হিসাব করিয়া দেখিল এই পত্র অনিলের হাতে গিয়া পৌছিবার ঠিক্ সাতদিন পূর্ব্বে তাহার চরম পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে। উদ্বেগে দুর্ভাবনায় সারা রাত্রি আর সে ঘুমাইতে পারিল না; থাকিয়া থাকিয়া একটা রুক্ষ ঔদ্ধত্য তাহার মনের মধ্যে অপমানের ঝঞ্ঝনা হানিতে লাগিল! নির্ম্মম দাসত্ব-সম্মান। অতিনির্ম্মম! এক-একবার পাচকের কথা মনে হইতে লাগিল। যদি কেহ তাহার কোনও সংবাদ আনে, তাই উৎকর্ণ হইয়া সে পথের দিকে কান পাতিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। শেষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার অন্য চিন্তায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

সারা রাত্রি কাটিল। পরদিন বেলা বারটার সময় সুরসুন্দর হাঁসপাতাল হইতে জনৈক কুলির হাতে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইল, "বিমলবাবু, বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইলাম, পাচক তাহার ঔষধের শিশি ও গায়ের কাপড় লইয়া একজন পরিচিত লোকের সহিত, কাল সন্ধ্যা সাতটার ট্রেনে তাহার দেশের দিকে গিয়াছে। খুব সম্ভব সে নিরাপদেই দেশে গিয়া পৌছাইবে। এখন হৈ চৈ করিয়া লাভ নাই। ব্যাপারটা চাপিয়া যাওয়াই সকলের পক্ষে মঙ্গল।"

নমিতা নূতন ভাবনায় পড়িল। টাকাগুলি কেমন করিয়া সকলের অগোচরে ডাক্তার-বাবুর স্ত্রীর কাছে পৌছাইয়া দেওয়া যায়?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গান।

(মূলতান)

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
হৃদয় উদাসে!
কোথা তুমি প্রিয়তম,
পরাণ উছাসে!

তোমায় আজি পেলে প্রাণে,
ভরাই হৃদয় গানে গানে,
জীবন-ভরা অশ্রু আমার
মুছাই নিমেষে!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারকেশ্বর।

তারকেশ্বর হুগ্‌লি-জেলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুর 'সব-ডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা শিবের জন্যই বিখ্যাত। ষ্টেশন হইতে মন্দিরটি প্রায় ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত। সকল দিনেই দেবদর্শনার্থ লোকে এখানে সমাগত হয়; তবে সোমবারই অতিপ্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানে

আসিবার জন্য বৎসরের কোনও কাল নির্দ্দিষ্ট নাই। সকল ঋতুতে এবং সকল দিনেই এখানে আসিবার নিয়ম আছে। মহাদেবের পূজার জন্য জমীদারি আছে। তাহার উপস্বত্ব হইতে দেবপূজা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেবদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিদিগের পূজা হইতেও মন্দিরের বিলক্ষণ আয় হইয়া থাকে। মহান্ত শিবের পূজার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যাহা কিছু আয় হয়, যাবজ্জীবন তিনিই তাহার ভোগ করেন। তারকেশ্বরে দুইটি মেলা হইয়া থাকে:—প্রথমটি শিবরাত্রের সময়; এবং দ্বিতীয়টি চৈত্রমাসের সংক্রান্তির সময়। শিবরাত্রে অন্যূন বিশ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই সময় লোকেরা নির্জ্জল উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়া শিবপূজা করে। শিবরাত্রের মেলাটি তিন দিন থাকে। দ্বিতীয় মেলাটি চড়ক-পূজায় হয়। চৈত্রমাস ব্যাপিয়া শূদ্রসন্ন্যাসিগণ দিবাভাগে উপবাস করেন ও সূর্য্যাস্তে ভোজন করেন। চড়ক-সংক্রান্তির দিন তাঁহারা তারকেশ্বরে সমাগত হইয়া গৈরিক উত্তরীয় মোচনপূর্ব্বক শিবপূজা করেন। অধুনা চড়কোৎসব পূর্ব্বকালের ন্যায় ভয়াবহ নহে। পূর্ব্বে সন্ন্যাসিগণ স্বীয় চর্ম্মভেদ করিয়া ঘূর্ণি খাইতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের কষ্ট যৎপরোনাস্তি হইত। এখন তাঁহারা কোমরে পেটি পরিয়া সেই পেটির সহিত চড়কগাছের আংটা লাগাইয়া লন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কষ্টও হয় না এবং ঘূর্ণি খাইতে অনেক সুবিধা হয়।

তারকেশ্বরের মহাদেব-সম্বন্ধে প্রবাদ এইরূপ যে, অযোধ্যার অন্তঃপাতী মহোবাগোরক্ষালিক-নামক স্থানের বিষ্ণুদাস-নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা মুসলমানদিগের অধীনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া সহচর-সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমনপূর্ব্বক হরিপাল-নগরের সন্নিকটস্থ বলাগোড়ের রামনগর-নামক গ্রামে উপস্থিত হ'ন্। তাঁহার সহিত পাঁচশত অনুচর ছিল। এতদ্ব্যতীত একশতজন কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণও তাঁহার সহিত ছিলেন। নবাগত-ব্যক্তিদিগের বিচিত্র বেশ, বিচিত্র কেশ, বিচিত্র শ্মশ্রু প্রভৃতি ও তাহাদিগকে শস্ত্রপাণি দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাহাদিগকে দস্যু বিবেচনা করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করে। ফলে নবাব-কর্ত্তৃক রাজা আহূত হ'ন্। তখন রাজা স্বয়ং নবাবের সহিত সাক্ষাৎকারে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া থাকিবার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। নবাব রাজার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ চাহিলে রাজা উত্তপ্ত লৌহশলাকা হস্তে ধারণ করেন এবং তাঁহার কোনও দুরভিসন্ধি না থাকাতে তিনি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলেন না; তদ্দর্শনে নবাব তাঁহাকে ৫০০ বিঘা জমি থাকিবার জন্য দান করেন। এই জমীগুলি তারকেশ্বরের চারি মাইল দূরে অবস্থিত।

রাজা বিষ্ণুদাসের বরমলসিংহ-নামক জনৈক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম-পরিগ্রহ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তারকেশ্বরের জঙ্গলে তাঁহার অবস্থিতি-কালে একদা তিনি দেখিলেন যে, অনেকগুলি গর্ভিণী গাভী দুগ্ধভারে মন্দ-গতি হইয়া বনে প্রবেশ করিল কিন্তু বন হইতে প্রত্যাগমনকালে তাহারা দুগ্ধভার-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। তখন তাঁহার মনে

কৌতূহল জন্মিল যে, কে এই গাভীগুলিকে দোহন করিয়াছে? অনুসন্ধানেচ্ছু হইয়া তিনি একদিন গাভীদিগের সহিত বনে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু যাহা তিনি দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি দেখিলেন, গাভীগুলি একখণ্ড প্রস্তরের উপরে পর্য্যায়ক্রমে যাইয়া দণ্ডায়মান হইতেছে ও তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধধারা স্বতঃই নিঃসৃত হইয়া প্রস্তরোপরি পতিত হইতেছে। নিকটে সমাগত হইয়া আরও দেখিলেন যে, প্রস্তরটিতে রাখালগণ ধান কুটিয়া খাওয়াতে তথায় একটি গহ্বর হইয়া গিয়াছে; সেই গহ্বরেই দুগ্ধধারা পতিত হইতেছে। রাত্রে তারকেশ্বর মহাদেবের আকৃতিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "প্রস্তরটি স্থানান্তরিত না করিয়া তদুপরি তুমি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। তুমিই সেই মন্দিরের প্রথম মোহান্ত হইবে।" বরমলসিংহ স্বীয় ভ্রাতাকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অবগত করাইলে উভয় ভ্রাতা মিলিত হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মিত করেন। দেবাদেশানুসারে বরমলসিংহ তাহার প্রথম মোহান্ত হ'ন। কালে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ত্তমান মন্দিরটি বর্দ্ধমানের মহারাজ নির্ম্মাণ করান। হাবড়া-নিবাসী চিন্তামণি দে মন্দিরের সম্মুখে শ্বেতপ্রস্তরের একটি দালান প্রস্তুত করাইয়া দেন। চিন্তামণিবাবু অসাধ্য রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি এই মানস করেন যে, যদি তিনি রোগমুক্ত হ'ন তবে একটি দালান তৈয়ার করিয়া দিবেন। রোগমুক্ত হইলে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন। অসাধ্য-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে লোকে তারকেশ্বরে আসিয়া হত্যা দেয়। স্বপ্নে যেরূপ আদেশ হয় তদ্রূপ করিলে লোকে রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

মোহান্তকে অবিবাহিত থাকিতে হয়। ইনি দশনামি-সন্ন্যাসিদলভুক্ত।

খড়দহ—(খড়্‌দা)।

খড়দহ বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাকপুর 'সবডিভিসনে'র একটি গ্রামমাত্র। ইহা হুগ্‌লি-নদীর উপর অবস্থিত। এখনকার লোকসংখ্যা ১৭৭৭ জন। স্থানটী বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান। চৈতন্য-মহাপ্রভুর চেলা নিত্যানন্দ এইস্থানে বাস করিতেন। এতদ্ধেতু ইহা বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত প্রিয়। প্রবাদ এইরূপ যে, নিত্যানন্দ এস্থানে সন্ন্যাসিবেশে সমাগত হইয়া হুগ্‌লি-নদীতটে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তিনি একটী রমণীর অরুদ্ধ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক রমণীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রমণী বলিল যে, তাহার একমাত্র প্রাণসমা কন্যা বিগতজীবন হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কন্যাটী মরে নাই; নিদ্রা যাইতেছে। এ কথায় রমণীর কিন্তু প্রতীতি জন্মিল না। রমণী বলিলেন, যদি তিনি কন্যাকে সঞ্জীবিতা করিতে পারেন, তবে রমণী তাঁহার দাসী হইবেন। সন্ন্যাসী-ঠাকুরের অমত ছিল না। তিনি একে সন্ন্যাসী; তাহার উপর অকৃতদার। সুতরাং, এরূপ মাহেন্দ্রযোগ পরিত্যাগ করা অনুচিত বোধে তিনি কন্যাটীকে সঞ্জীবিতা করিয়া রমণীটীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। এখন সংসারে সন্ন্যাসী-ঠাকুর একা নহেন যে, যথাতথা

থাকিবেন। এখন তাঁহার একটী বাটীর আবশ্যকতা। জমীদারকে না মরিলে স্থান পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া, তিনি জমিদারের নিকট গমন করিয়া স্থান প্রার্থনা করিলে, জমিদার দহে (নদীতে) একগাছা খড় নিক্ষেপ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমার থাকিবার স্থান ঐখানে। নিত্যানন্দ প্রভাবশালী ব্যক্তি; তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই দহের জল তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল এবং তাঁহার থাকিবার উপযুক্ত একটু স্থান বাহির হইল। এইজন্যই গ্রামটি খড়দহ-নামে খ্যাত।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র হইতে খড়দহের গোঁসাই-বংশের উৎপত্তি। বৈষ্ণবগণ তাঁহা-দিগকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। দোলযাত্রা ও রাসের সময় খড়দহে মেলা হইয়া থাকে। এখানে শ্যামসুন্দরের মন্দির আছে।

তিনশত বৎসরের অধিক হইল রুদ্র-নামে জনৈক হিন্দুযোগী শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বল্লভ-পুরে আসিয়া বসতি করেন। স্বপ্নে রাধাবল্লভ তাঁহাকে দেখা দেন ও গৌড়ে যাইয়া রাজ-ধানীর দরজার উপরিস্থ প্রস্তর আনয়ন করিয়া দেবমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। রুদ্র গৌড়ে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির মন্ত্রীর নিকট যাইয়া দেবাদেশ জ্ঞাপন করেন। মন্ত্রি-মহাশয় হিন্দু ছিলেন। দেবাদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি প্রস্তরটীকে দেখিতে আসেন। এমন সময় দেখা গেল যে, প্রস্তর হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। তখন উপায় উদ্ভাবন করিতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি অবিলম্বে স্বীয় মনিবকে তথায় আনাইয়া দেখাইলেন যে, প্রস্তরটী ক্রন্দন করিতেছে। এরূপ অপয়া প্রস্তর রাজবাটীতে রাখিতে নাই; সুতরাং, প্রস্তরটী দূর করা আবশ্যক। মুসলমান মনিব তৎক্ষণাৎ প্রস্তরটী অপসৃত করিতে আদেশ দিলেন। রুদ্র তখন প্রস্তরটীকে নৌকার উপর আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাহা এত বৃহৎ যে নৌকায় তাহার স্থান হইল না। মাঝিরা নৌকা হইতে প্রস্তরটীকে জলে ফেলিয়া দিল। দৈবকৃপায় সেই প্রস্তর ভাসিতে ভাসিতে বল্লভপুরে পহুঁছিল। তখন সেই প্রস্তর হইতে তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করা হয়। যথা, বল্লভ, শ্যামসুন্দর ও নন্দদুলাল।

নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি লইতে বাসনা প্রকটিত করেন কিন্তু রুদ্র তাহাতে সম্মত নহেন। একদিন রুদ্র পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন এরূপ সময় বীরভদ্র নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ সময়ে বৃষ্টি আসিয়া পিতৃকৃত্যে বাধা দিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বীরভদ্র তখন করযোড়ে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। দৈব-শক্তিতে তথায় বৃষ্টি পতিত হইল না; কিন্তু তাহার চতুঃপার্শ্বে মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। রুদ্র ব্যাপার-দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং বীরভদ্রকে একজন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। সময় বুঝিয়া বীরভদ্র একটি মূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। রুদ্রও আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি দান করেন। এই মূর্ত্তিটী এখন খড়দহে আছে। রাধা-বল্লভের মূর্ত্তিটী বল্লভপুরে এবং নন্দদুলালের মূর্ত্তি সাহিবানা-নামক গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামটী ব্যারাকপুর হইতে তিন মাইল দূরে

দুষ্ট হইয়া থাকে। একদিনে উক্ত মূর্ত্তিত্রয় দর্শন করিলে অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়। খড়দহের বৈষ্ণব মন্দিরের অদূরে ২৪টী শিব-মন্দির আছে।

খড়দহে জুতার ব্রস্ ও ইঁট যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ার হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নব স্মৃতি।

মৃত-সঞ্জীবনী তোমার রাগিণী
মানস-তটিনী-তট উছসিয়া,
নব অনুরাগে বিনোদ সোহাগে
কোন্ শুভযোগে উঠিল বাজিয়া!
উঘারিয়া হার হৃদয়ে আমার
প্রেমের ভাণ্ডার আছিল কি খোলা!
অলিকুল গুঞ্জে কুসুমের পুঞ্জে
পরাণের কুঞ্জে দি'ছিল কি দোলা?

বুঝি শুভ ক্ষণে অন্তর-গগনে
কবে কোন্ দিনে জ্যোছনা ফুটিল;
তরল সুধার পরশটি আমার
পরি তারা-হার হাসিয়া উঠিল!
নাচিয়া কাঁদিয়া তাপিত এ হিয়া
দিনু কি সঁপিয়া চরণে তোমার?
মধুর বচনে তোষিয়া যতনে
নি'ছিলে কি টেনে দীন-উপহার?

এ ক্ষীণ যৌবনে কবে কোন্ ক্ষণে
তোমার স্পন্দনে ডেকেছিল যান?
তুমি কি হে বঁধু, লুটেছিলে মধু,
এসেছিলে শুধু শুনিয়া আহ্বান?
বসন্তের গানে তোমার মিলনে
ভাঙা এই বীণে বেজেছিল সুর?
আজি কোথা তুমি, হে হৃদয়-স্বামী,
ভাবি দিন-যামী কোথা—কতদূর!

আজি যে লাঞ্ছিত, ওগো ও বাঞ্ছিত,
হইয়া বঞ্চিত তব অনুরাগে;
আজি মম বীণা বাজে না বাজে না
প্রেমের মূর্চ্ছনা ললিত সোহাগে।
সুপ্ত এ জীবন, সুপ্ত ত্রিভুবন,
অলির গুঞ্জন থামিয়া গিয়াছে;
কোকিল-কাকলি পাপিয়ার বুলি
থেমেছে সকলি,—কলরব আছে!

দূরে—বহুদূরে সহরে সহরে
শুভ নব সুরে বাজিতেছে বাঁশী;
সুধা-তান তা'র শ্রবণে আমার
মথিয়া আঁধার আসিতেছে ভাসি!
আজি মনে পড়ে, নিকুঞ্জ-কুটীরে
বিনোদ বাহারে গেয়েছিনু গান;
আজি মনে পড়ে, বঁধুয়ার তরে
উঠেছিল সুরে আকুল আহ্বান!

পুনঃ বিনোদন! কর আগমন,
না-হয় যৌবন গেছে ফুরাইয়া;
যা' আছে এ ঘরে দিব তা' তোমারে,
এস হে অন্তরে আলো বিথারিয়া।
তোমার—তোমার, আমি যে তোমার!
কবে একবার দিছি ফিরাইয়া;
ওহে ভুলে যাও, আসিয়া দাঁড়াও,
সযতনে দাও ব্যথা মুছাইয়া।

মরুবেণ।

মহাত্মা যিশু ও তাপস হোসেন মন্‌সুরের জীবনে সাদৃশ্য।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখা যায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত সাধু মহাত্মগণ ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল নূতন সত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের প্রচার-কালে তাঁহারা কি কঠোর উৎপীড়নই না সহ্য করিয়াছিলেন!

মহাত্মা যিশুর জীবন-চরিতে দেখিতে পাই, তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি বিতাড়িত হইয়াছেন, প্রলোভনের সঙ্গে কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন এবং অবশেষে "মানব ঈশ্বরের সন্তান" এই নবসত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ হইয়া কণ্টক-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন!

মহাত্মা যিশুর ন্যায় মুসলমান তাপস হোসেন মন্‌সুরও "অনল্ হক্" (আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত) এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া, নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অবশেষে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-পদ, কর্ত্তিতজিহ্ব ও উৎপাটিত-চক্ষু হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মজীবনে এই একই আশ্চর্য্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাত্মা যিশু নরনারীর পাপ, মোহ ও অজ্ঞানতার কণ্টক সর্ব্ব অঙ্গে ও মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। তাহাতেই মানব পরিত্রাণের সমাচার পাইল; অজ্ঞানতা দূর হইল; মানব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইল। তখন মানব যিশুর নব সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিল।

মহাত্মা হোসেন মন্‌সুরও যিশুর ন্যায় অনল্ হক্ "আত্মাই ব্রহ্ম" এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-প্রত্যঙ্গ হইয়া ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিলেন,—"হে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, তুমি ইহাদিগকে কৃপা কর। এ দেহ কিছুই নয়, আত্মাই সর্ব্বস্ব, সেই স্থলেই তোমার প্রকাশ;—আত্মাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমার হস্ত, পদ, চক্ষু সকলই যাইল; জিহ্বাও এখনি যাইবে, কিন্তু প্রাণ আমার তথাপি বলিবে 'অনল্ হক্ (অহং ব্রহ্ম)।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার জীবন শেষ হইল।

দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "আমাদের কি ভ্রম! আমরা ইহাকে অবিশ্বাসী কাফের বলিয়াছিলাম। ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-বিশ্বাসী। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহাঁর মুখ হইতে "অহং ব্রহ্ম" (অনল্ হক্) এই মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া ইহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই নাই। আজ ইনি জীবন দান করিয়া এই নব মহাসত্য মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন যে, শরীর কিছুই নয়; আত্মাকে জান; আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত; আত্মাই আমি; 'অনল্ হক্'।"

শ্রীমতী—

আত্মার অনন্তত্ব।

কত অণু-পরমাণু-গঠিত শরীর,
রক্ত-মাংস-মেদ-পূর্ণ হয়েছে দেহীর;
চক্ষু কর্ণ নাসিকা সে সুন্দর বদন,
উজ্জ্বল লাবণ্য-রাশি মুগ্ধ করে মন!
অমিয় বচন-রাশি শ্রবণ জুড়ায়,
মানুষ সুন্দর রূপে জগৎ মাতায়!
হেন দেহে মানবের কতই যতন,
তিলেক হইলে ত্রুটি ভাবে অনুক্ষণ!
হেন দেহে সুখ-তৃষ্ণা অসীম ধরায়;
বল দেখি ক'দিনের সেই সমুদায়?
ধন-মান-পুত্রে লোক বিপুল আশায়—
বাঞ্ছে সে অনিত্য সুখে, উন্মত্ত ধরায়;
কিন্তু হায়, অন্তরের আত্মা যায় ভুলে!
সকলি অসার কার্য্য;—ভ্রম দেখি মূলে!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

অদৃষ্টলিপি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমাকান্ত চলিয়া যাইলে ভুবনেশ্বরী সমস্ত বাড়ী অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সব চেয়ে তাহাদের শয়নগৃহে বড়ই শূন্যতা বোধ হইল। যেখানে 'চেয়ারে'র উপরে রমাকান্ত বসিতেন, যেখানে বসিয়া পত্নীর সহিত ধর্ম্মা-ধর্ম্মের কথা, কর্ম্মাকর্ম্মের কথা, দেশের কথা, সংবাদপত্রের মর্ম্মকথা, নিজোদর আশা-ভরসার কথা বলা-বলি করিতেন, সেই সব স্থান প্রতিক্ষণে বৃশ্চিকরূপে ভুবনেশ্বরীকে দংশন করিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরীর বড় কান্না আসে; কিন্তু তাহার চক্ষে জল দেখিলে তাহার শিশু পুত্র দুধীর খেলা-ধূলা ছাড়িয়া মায়ের মুখের পানে আকুলনেত্রে চাহিয়া থাকে; সেটা তো সহ্য করা যায় না। তখন ছেলেকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইয়া তাহাকে, হয় খেলানা, না হয়, খাবার দিতে হয়। তাহার স্নেহময় দাদা গোপীনাথও কত রকম সান্ত্বনা ও সহানুভূতি করেন। কখনও তিনি বলেন, "আজ তুই চুল বাঁধিস্ নি কেন, ভানু?" কখনও বা তিনি বলেন, "তোর মুখখানি দিনে দিনে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে; নিজের খাওয়া-দাওয়ার দিকে তুই মোটেই মন দিস্ না, এ তোর বড় দোষ। বউকে নিয়ে আসতে বলিস্ তো এনে দিই। তা সে আবার বাড়ীঘর ছেড়েই বা কি করে আস্‌বে? তা বাপু দিদিটী আমার! তুমি নিজের প্রতি একটু বিশেষ যত্ন কোরো।" গোপীনাথ মনে মনে জানিতেন, তাঁহার স্ত্রী মোহিনী বড় স্বার্থপরায়ণা, বড় মুখরা এবং বড়ই গর্ব্বিতা। তাহার জন্য গোপীনাথ এক-দিনের জন্যও একটু শান্তি পা'ন নাই। তাহাতে ভুবনেশ্বরীর নিকটে আনা কোনও মতে সঙ্গত নহে। যাহা হউক, সহোদরের সান্ত্বনা ও স্নেহে ভুবনেশ্বরী অনেক তৃপ্তি লাভ করিত। তবে রাত্রে যখন দাদা ঘুমাইতেন, খোকা ঘুমাইত, তখন প্রাণাধিক স্বামীর মধুমাখা স্মৃতি অগ্নিমাখা হইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রাণ পর্য্যন্ত

দগ্ধ করিত। তখন ভুবনেশ্বরী যুক্তকরে ডাকিত,"হে ভগবন্, তাঁকে ভাল রাখ ; তিনি ভাল আছেন, সেই সংবাদ আমায় দাও।"

ভুবনেশ্বরীর এই রকম কাতরতার আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। তাহা বলিতেছি।

রমাকান্ত প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বদিনে দ্বিপ্রহরে নীচের ভলায় বৈঠকখানায় বসিয়া "বেঙ্গলি"-কাগজ পড়িতেছিলেন ও সদর দরজা খুলিয়া রাখিয়া দারবান্ রামদীন পাঁড়ে বেঞ্চির উপরে ঘুমাইতেছিল। রমাকান্ত সহসা মনুষ্যাগমন অনুভব করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, পার্শ্বে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে।

রমাকান্ত দেখিলেন, আগন্তুকের বয়স নবীন, আকৃতি সুন্দর, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, হস্তে ত্রিশূল ও পরিধানে গৈরিক বস্ত্র। বিস্মিত ভাবে রমাকান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি ?" আগন্তুক বলিল, "নবীনানন্দ স্বামী।"

ভিক্ষুক বা অতিথি পাইলে রমাকান্ত তাড়াইয়া দিতেন না ; যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি নবীনানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চান্ আপ্‌নি ?"

নবীনানন্দ উত্তর করিলেন, "আপাততঃ কিছুই নয়।"

রমাকান্ত বলিলেন, "বসুন।"

নবীনানন্দ বসিলেন না ; রমাকান্তের মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাবুজী প্রবাসে যাইতেছেন ?"

রমাকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় শুনিলেন ?"

ধীরে ধীরে নবীনানন্দ বলিলেন, "কোথাও শুনি নাই। আপনার অদৃষ্টলিপি দেখিতেছি।"

এ রকম ভাগ্যগণনায় যদিও রমাকান্তের বড় বিশ্বাস ছিল না ; তথাপি তিনি বলিলেন, "আবার ফিরে আসব কবে, বলুন দেখি ?"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া নবীনানন্দ বলিলেন, "আপনার পত্নী পতিব্রতা সতী। তাঁহার একটী শিশুপুত্র আছে।"

রমাকান্ত চমৎকৃত হইলেন।

নবীনানন্দ পুনরপি বলিলেন, "ডাক্তার-বাবু! এ সুখের গৃহ ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া কি হইবে ?—আপনি যাইবেন না।"

রমাকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তা কি হয় ? এতটা প্রস্তুত হইয়া একটা পথের লোকের কথায় নিরস্ত হওয়া—ছি! ছি! তা কি হয় ?

কিছু ক্ষণ দুইজনেই নীরব। তারপরে নবীনানন্দ কহিলেন, "বাবুজী! না গিয়া পারিবেন না। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমাকান্ত বলিলেন, "কেন ?"

ত্রিশূলধারী একটু বিলম্বে বলিলেন, "হয় তো শীঘ্র আসিতে পারিবেন না! অদৃষ্টলিপি পাঠ করা কাহার সাধ্য ?"

এবার বিদ্রূপের ভাবে রমাকান্ত বলিলেন, "আপনার সাধ্য আছে বৈ কি ?"

নবীনানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অতি-ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আমি গুরুদেবের দাসানুদাস।"

ত্রিশূলধারীর কথা যে রমাকান্ত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পত্নী উহিয়

হইবে ভাবিয়া, তাহার কাছে তিনি সে-প্রসঙ্গ-মাত্র করিলেন না। তবে সেই দিন সন্ধ্যাকালে দুইজনে যখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন, তখন রমাকান্ত কথায় কথায় বলিলেন, "দেখ! মনুষ্য-জীবন তো নশ্বর। যদি আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন সহসা চলে যাই, তবে যে জীবিত থাকবে, সুধীরকে প্রকৃত মানুষ করা তা'রই প্রধান কর্ত্তব্য হবে; এ আমাদের মনে রাখা আবশ্যক।"

শরীরের যেখানে বেদনা, সেই স্থানে আঘাত লাগিলে ব্যথী যেমন কাতর হইয়া পড়ে, স্বামীর কথা শুনিয়া ভুবনেশ্বরী তেমনি কাতর হইয়া পড়িল। সে বলিল, "তুমি অমন কথা বোলো না; শুনতে আমার ভয় করে। আমি যেন জন্ম-এয়োতী হয়ে, সুধীরের সকল ভার তোমার ওপরে দিয়ে চলে যাই।" অবশ্য রমাকান্ত সহধর্ম্মিণীকে, হাসিয়া, আশ্বাস দিয়া আদর করিয়া সে ব্যথা ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি চলিয়া গেলে ভুবনেশ্বরীর মনে সেই কথা, সেই "পোড়া কথা" বারংবার জাগিত। তাহার স্বামীর জন্য এত অধিক কাতরতার প্রধান কারণ তাহাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা—

প্রতীক্ষা।

জীবনে আমার সে-দিন কবে
আসিবে বিশ্বভূপ,
সবার মাঝারে সে-দিন আমি
দেখিব তোমার রূপ?
সংসার-মাঝে নির্ব্বোধ, তাই
বল গো অন্তরযামী,
কোন্ শুভদিনে তোমারে প্রভু
বুঝিতে পারিব আমি?

আছে মোর কান তবুও বধির;
কিছু না কখনো শুনি!
কবে গো শুনিব মঙ্গলময়,
তোমার অমৃতবাণী?
আমাদের মাঝে শুভাশীষ তব
কবে গো আসিবে নেমে,
শুষ্ক হৃদয় কবে গো আমার
ভরিয়া উঠিবে প্রেমে!

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অশ্ব।

অশ্বের যত্নের ভার সহিসের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। কিন্তু তা বলিয়া যে গৃহকর্ত্রী এ-বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকিবেন, তাহা নহে। গৃহকর্ত্রী যেটী স্বয়ং না দেখিবেন, সেটী অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে। প্রত্যেক অশ্বের জন্য একজন ঘাসওয়ালা এবং প্রত্যেক তিনটী অশ্বের জন্য একজন সহিস নিযুক্ত থাকা চাই। অশ্বের জন্য কৈফিয়ৎ সহিসকে দিতে হইবে। সহিস ঘাসওয়ালার বিরুদ্ধে যদি কিছু

বলে, তবে তাহার প্রতি ব
না। সহিসকে সকল বিষয়ে দায়ী করিলে তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে হইবে বলিয়া, তাহার অনেকটা সময় যাইতে পারে; কিন্তু কখনও কখনও তাহাকে পুরস্কার দিলে সে আর ক্ষুণ্ণ হইবে না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর একবার এবং সন্ধ্যার পর একবার সহিস আসিয়া গৃহকর্ত্রীর নিকট হইতে হুকুম লইয়া যাইবে। এরূপ করিলে সে ঘোড়াকে জুতিবার পূর্ব্বে তাহাকে উত্তমরূপে খাওয়াইবার অবসর পাইবে।

প্রত্যূষে ঘোড়ার দানার সিকি অংশ ঘোড়াকে খাওয়ান চাই। গ্রীষ্মকালে দানা খাওয়াইবার পূর্ব্বে ঘোড়াকে সামান্য জল খাওয়ান উচিত। শীতকালে এরূপ প্রথা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নাই। দানা খাওয়ানর পর হাল্‌কা মালিশের আবশ্যক। ঘোড়ার গাত্রবস্ত্র উদ্ঘাটিত করিয়া একটী কোণে রক্ষা করিবে। অতঃপর অশ্বশালাকে পরিষ্কার করিবে। ইহার পর ঘাসওয়ালাকে ঘাস আহরণের জন্য পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু তাহাকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিবে।

অশ্বারোহণের পর অশ্বকে ধরিবার জন্য সহিস অশ্বশালার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং ঘোড়ার উপর একখানা বস্ত্র রাখিয়া তাহাকে পাদচারণা করাইবে। এতদ্দ্বারা অশ্বের শৈত্য লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ঘোড়া দলা হইলে তাহাকে জল খাওয়াইয়া অল্প পরিমাণে ঘাস খাইতে দিবে। ইতোমধ্যে যে সকল ঘোটক চড়া হয় নাই, তাহাদিগকে ঘুরাইয়া লইয়া আসিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের পর তাহাদিগকে জলপান করাইবে। অতঃপর সকল ঘোড়াগুলিকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য শস্য খাইতে দিবে। বেলা তিনটার সময় তাহাদিগকে পুনরায় জল খাওয়াইয়া ৪টার সময় তাহাদিগকে পুনরায় শস্য খাইতে দিবে। অনন্তর উত্তমরূপে দলার পর তাহাদিগকে সান্ধ্য ব্যায়ামের জন্য বাহির করিবে। তাহারা প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে রাত্রিকালের জন্য ভোজন করাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ঘোড়াকে আহার তিনবার দেওয়া উচিত। ইহার কম আহার দেওয়া উচিত নহে। ছোলা শুষ্ক দেওয়াই বিধি; অথবা তাহাতে সামান্য জলের ছিটা দিতে পার। ঘোড়াকে ছোলা খাওয়াইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে জল পান করাইবে; কিন্তু ছোলা খাওনর অব্যবহিত কাল পরে জল দিবে না।

একই আহার প্রতিদিন খাওয়ান উচিত নহে। তাহাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকিতে পারে না। আহারের পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্য-রক্ষার একটি প্রধান উপায়। শস্য খাওয়াইতে হইলে তাহার সহিত যব, ছোলা বা জৈ-চূর্ণ দিতে পারা যায়।

ঘোড়াকে সপ্তাহে একবার চোকর-মণ্ড খাওয়ান উচিত। এক বা দুই সের গাজর, কাঁচা গম, লুসার্ণ, ঘাস অথবা ইক্ষু যদি প্রত্যেক দিন খাওয়ান হয়, তবে ঘোড়ার স্বাস্থ্য অতিশয় উত্তম থাকে। ঘোড়ার কোনরূপ অসুখ হইলে সহিস যেন গৃহকর্ত্রীর নিকট গোপন না করে। যদি সময়ে সময়ে সহিসকে বক্সিস দেওয়া হয়, তবে সে কিছুমাত্র গোপন করিবে না।

শীত-সমাগমে অশ্বশালায় নিযুক্ত ভৃত্য-গণকে একখানা করিয়া কম্বল দিবে; নতুবা তাহারা ঘোড়ার কম্বল চুরি করিবে। অর্থের অস্বচ্ছলতা থাকিলে কম্বল তাহাদিগকে একেবারে দান করিবে না; বরং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, চাকুরি পরিত্যাগ করিলেই কম্বল ফেরৎ দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে কম্বলকে ধৌত করাইয়া গৃহে রাখিয়া দিবে।

ঘোড়া যদি উত্তমরূপে দলা হয় তবে তাহারা অত্যন্ত আব্‌হাওয়ার অনুভাবক হয়। সুতরাং, ঘোড়ার কাপড় দিতে কখনও ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি ঘোড়াকে সুস্থ রাখিতে হয়, তবে এরূপ করিতেই হইবে।

অশ্বশালার মেজে কাঁচা মৃত্তিকার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সমতল হওয়া চাই। বন্ধুর মেজে ঘোড়ার কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। মেজেকে সপ্তাহে একবার গোবর, জল ও বালুকা দ্বারা লিপ্ত করা বিধেয়। খড় ঘোড়ার পক্ষে উত্তম বিছানা। যেখানে ঘাস অধিক সেখানে লোকেরা দূর্ব্বা ব্যবহার করিয়া থাকে। অশ্বশালায় ঘোড়াকে জলপান করাইবার জন্য একটা নাদ থাকা উচিত। জল টাট্‌কা হওয়া চাই। বেশী জল পরিত্যাজ্য।

এক্ষণে অশ্বরথীদিগকে কি কি করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

(১) ঘোড়াকে আহার করাইবার পূর্ব্বে জলপান করিতে দিবে; পরে নহে।

(২) শস্য কখনও আর্দ্র দিবে না।

(৩) সামান্য রোগ হইলে বা আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ত্রীকে জানাইবে।

(৪) ঘাসকে উত্তমরূপে পিটিয়া খাওয়াইবার একদিন পূর্ব্বে শুষ্ক করিতে দিবে।

(৫) ঘোড়া দলিতে হইলে দুইজনে দলাই বিধি।

(৬) ঘোড়ার পা কখনও ধৌত করিবে না। যদি ক্বচিৎ ধৌত করা হয় তবে উত্তম-রূপে শুষ্ক করিতে হইবে।

সহিস যে কেবলমাত্র ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিয়াই পরিত্রাণ পাইবে, তাহা নহে; তাহাকে ঘোড়ার সাজের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জিন্‌কে সাবান-দ্বারা সপ্তাহে এক-বার ধৌত করিলেই যথেষ্ট। ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিবার জন্য রেকাব প্রভৃতি লৌহ-পদার্থ শুষ্ক বালুকা দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইবে। যদি জলে ধৌত করা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে জীনের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে নষ্ট করে; সুতরাং, জীন্ রাখিবার স্থানের উপর কর্পূরের পুটুলি বা নিমপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

বড় ও ছোট।

মোটর সওয়ারি কহে গরুর গাড়ীরে
"বিক্ তোরে, মন্দবেগ ধরিস্ রে অতি।"
বিনয়ে গরুর গাড়ী উত্তরিল তারে
"বিকল হইলে তুমি আমি তব গতি।"

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৭)

বাঙ্গলা-দেশে মেয়ে দশ বৎসরে পড়িলেই তাহার বিবাহ দিতে হয়। নচেৎ সমাজ বড় চটেন। আত্মীয়-বন্ধুগণ কন্যার মাতাপিতাকে ঘৃণা করেন। প্রতিবেশিবর্গের হাসি-টিট্‌কারির জ্বালায় কন্যার মাতাপিতাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। যদি কাহারও কন্যা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে এমন বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইতে থাকে যে, তাঁহার নিরুদ্বেগে দিনযাপন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এ-দিকে প্রচুর অর্থের সংস্থান করিতে না পারিলেও কন্যার সৎপাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। কন্যাটী যতই সুন্দরী বা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া হউক্ না কেন,—মনোমত দক্ষিণা না পাইলে কোনও ভদ্রনামধারী ব্যক্তি সে-কন্যা গ্রহণ করেন না। কাজেই বাঙ্গলাদেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া একটা বিষম সর্ব্বনাশের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই কন্যার বিবাহে বাঙ্গালীর গৃহে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই অধিক দৃষ্ট হয়। তাই বাঙ্গালীর কন্যার জন্মমাত্র কি এক অশুভ আশঙ্কায় মাতাপিতার প্রাণ কাতর হয়। যেন একটা দারুণ অভিশাপ লইয়া বাঙ্গালায় রমণী জন্মগ্রহণ করে। আমাদের বালিকা বিভাও হতভাগিনী বঙ্গবালা। তাই দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে তাহার পিতা এবং মাতা বিভার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

বিভার পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি নহেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কোনও 'মার্চ্চেণ্ট'-আফিসে তিনি কেরাণীগিরি করেন; অনেকগুলি পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ তাঁহাকে করিতে হয়। আয় সামান্য বলিয়া বাসের বাড়ীখানির অর্দ্ধাংশ ভাড়া দিতে হইয়াছে; অপরার্দ্ধাংশে কায়ক্লেশে তাঁহারা বাস করেন। তাহাকে আরও দুইটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রীত্যানুযায়ী দক্ষিণাদানে অশক্ত হওয়ায় কন্যাগুলি মনোমত পাত্রে অর্পিত হয় নাই। দুইটীকেই যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষের পাত্রের দর বড় চড়া; দরিদ্রের সে বাজারে প্রবেশ করিবার সাধ্য বা অধিকার নাই। বিভার জন্যও তিনি তাঁহার অবস্থার অনুযায়ী পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের আদৌ ইচ্ছা নহে যে, এমন প্রস্ফুটিত-গোলাপতুল্য সরলা বালিকা-ভগ্নীটিকে একটা বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করা হয়। কিন্তু মনের বাসনা থাকিলে কি হইবে? তাহার ত অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই! অর্থ ব্যতীত মনের মত পাত্র সে কোথায় পাইবে? সে চায় সর্ব্বগুণান্বিত একটী যুবকের হস্তে তাহার এই আদরিণী কনিষ্ঠা ভগ্নীটিকে প্রদান করে। অমৃতে অরুচি কাহার? কিন্তু অমৃত কিনিতে হইলে অর্থের আবশ্যকতা। অতুলের সে অর্থ কোথায়? অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া একদিন সে সুধীরের কাছে বিভার বিবাহের কথা উত্থাপন করিল এবং সুধীর যাহাতে বিভাকে বিবাহ করে, সে অনুরোধও করিল।

সুধীর তাহাকে বলিল, "ভাই, তা'তে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু বাবার অমতে ত বিয়ে কর্‌তে পার্ব্বো না।"

অতুল সাগ্রহে বলিল, "এই ত কথা!—যদি তাঁর মত হয়, তা'হ'লে তুমি ত বিনা দক্ষিণায় আমার বোন্‌টীকে বিয়ে কর্ব্বে?"

সুধীর বলিল, "নিশ্চয়!—আমরা দরিদ্র হ'লেও অর্থলোলুপ নই!"

সুধীরের কথায় তাহার বিশ্বাস হইল। কারণ, সুধীরের সহিত সে কমলাপুর গিয়া হরনাথবাবুকে দেখিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি যে অর্থ-পিশাচ হইতে পারে না, ইহা অতুল বুঝিল। তাই সে তাহার পিতাকে লুকাইয়া হরনাথবাবুকে এক পত্র লিখিল।

যথাসময়ে সে-পত্রের উত্তর আসিল। হরনাথবাবু আহ্লাদের সহিত জানাইয়াছেন যে, তিনিও সুধীরের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। মেয়েটি যদি ভাল হয়, তা'হ'লে তাঁর এ-বিবাহে কোনও আপত্তি নাই। পত্র পাঠ করিয়া অতুলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহার আদরের ছোট বোন্‌টিকে যে একটা অপদার্থের হাতে পড়িয়া সারা জীবন অশান্তি ভোগ করিতে হইবে না; এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রিয়সুহৃদ্ সুধীর যে তা'র স্বামী হইবে; ইহা অপেক্ষা অতুলের আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? হায়! সংসারানভিজ্ঞ যুবক! এ-সংসারের কূট অভিসন্ধি তুমি এখনও কিছুই জান না!

পত্র-হস্তে অতুল একমুখ হাসি লইয়া মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "মা, বিভার বিয়ের জন্যে আর তোমাদের ভাব্‌তে হবে না। আমি তা'র খুব ভাল পাত্র ঠিক্ করিছি।"

মাতা সাগ্রহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে,—কোথায়?"

অ। এইখানেই।

মা। কি দিতে থুতে হবে?

অ। দিতে থুতে কিছু হ'বে না।—তবে আমরা মেয়ের গা সাজিয়ে এক এক খানা গহনা দেবো। তা'রা যেন ভদ্রলোক কিছু নেবেন না; তা'বলে আমাদের একেবারে কিছু না দেওয়া কি ভাল হয়? কি বল মা? কিন্তু এমন পাত্র লোকে টাকা দিয়েও পায় না।

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমাদের পোড়া বরাতে কি আর এমন সুবিধে জুট্‌বে বাবা!"

অতুল হাসিয়া বলিল, "জুট্‌বে কি? জুটেচে! এখন বাবাকে ব'লে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা দিয়ে ফেল! কি জানি নইলে হয় ত ফস্কে যেতে পারে।"

মা। পাত্রটী কে শুনি?

অ। আমাদের সুধীর গো—সুধীর।

মাতা, "ও—মা তাই বল!" বলিয়া নীরব হইলে, অতুল বলিল, "কি মা, চুপ ক'রে রইলে যে?"

মাতা মুখে একটি দুঃখ-সূচক শব্দ করিয়া বলিলেন,—"আ আমার কপাল, সে কি হ'বার যো' আছে বাবা!"

অতুল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা, হ'বার যো নেই কেন? আমি সুধীরের বাপ্‌কে চিঠী দিয়েছিলুম। এই দেখ, তিনি আমাকে লিখেছেন, মেয়ে পছন্দ হ'লেই তিনি বিয়ে দেবেন। টাকা তিনি চান্ না। বিভাকে দেখে কা'র পছন্দ না হবে? তবে আর হবে না কেন, মা?"

মাতা বলিলেন, "তার জন্যে নয়! ওরা যে বঙ্গজ কায়েৎ। ওদের সঙ্গে কি আমাদের চলিত আছে? তা' থাকলে আর ভাবনা ছিল কি?"

অতুল শুনিয়া মনে করিল ও-কথাটা কাজের কথাই নয়! তাই সে বলিল, "হ'লেই বা বঙ্গজ; তাতে দোষ কি? আমি জানি ওদের বংশ ভাল। আর অমন ছেলে তুমি পাঁচ হাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবে না। ও-সব বঙ্গজ ফঙ্গজ রেখে দাও। সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দাও যে, মেয়েটা সুখে থাকবে! তা না হয় ত, তোমার আর দু'মেয়ের মতন বুড়ো মাতালের হাতে প'ড়ে মরবে দুঃখে!"

মাতা-পুত্রে যখন এই সকল কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন অতুলের পিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা-পুত্রের কথার কিয়দংশ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই অতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে অতুল?"

অতুল পিতার কাছে সমস্ত বিষয় বলিল এবং সুধীরের সহিত বিভার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বলিল, "বাবা, সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দিন্; বিভা সুখে থাকবে!"

অতুলের পিতা সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিলেন; শুনিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তিনি বলিলেন, "তা কেমন করে হ'তে পারে?—আমরা হলুম দক্ষিণরাঢ়ী, ওরা হ'ল বঙ্গজ; ওরা ত আমাদের চল্‌তি ঘর নয়।"

অতু। চল্‌তি আর অচল্‌তি কি! বাবা! চলালেই চলে যায়। ওরাও কায়স্থ ত বটে! আর বংশও সৎ। তবে আর এতে দোষ কি?

দোষটা যে কি তাহা অতুলের পিতা জানেন না। শুধু অতুলের পিতা কেন? কেহই তাহা জানেন না। তথাপি একটা ব্যর্থ দলাদলি লইয়া সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়, ইহা দেখিয়াও কেহ দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না।

অতুলের পিতা বলিলেন, "তা কি হয়? যা কখন হয় নি, তা কেমন করে করো?"

অতুল বলিল, "বাবা, এইটেই আমাদের মহা ভুল। আর এই দলাদলিতেই আমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে এত বেগ পেতে হয়। ভারতে আমাদের স্বজাতির সকলশ্রেণীর মধ্যে যদি বিয়ের চল্‌তি থাকত, তা'হলে আর বরপণের এত পীড়াপীড়ি হ'ত না। এতে ত কোন দোষ নেই বাবা! সুধীরের সদ্বংশে জন্ম। সুধীরের বাপ্ অতিসজ্জন। এমন ছেলে আপনি পাঁচহাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবেন না।—আর অমত কর্‌বেন না; বিয়ে দিন্। মেয়েটা সুখে থাকবে। লোকের নিন্দার ভয়ে, মেয়েটার এমন ভাল বিয়ের সুযোগ ছাড়্‌বেন না।"

অতুলের পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অতুল এতক্ষণ মনে মনে ভয়ীর কষ্ট

সুখের কল্পনা করিতেছিল! এমন কি তাহাকে কি কি গহনা দিতে হইবে, মনে মনে তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন পিতার কথা শুনিয়া তাহার সকল আশা নিষ্ফল হইল। অতুল দুঃখিত হইয়া বলিল, "বাবা, আমি যে সুধীরের বাপ্‌কে চিঠী লিখেছিলুম! এই দেখুন, তিনি উত্তর দিয়েছেন। হয়ত, তিনি মেয়ে দেখ্‌তেও আস্‌বেন। কি বল্‌বো ভদ্রলোককে? আপ্‌নারা বাবা, অমত কোর্ব্বেন না; দিয়ে দিন্! লোকে নিন্দা কলেই বা। যে নিন্দা কর্ব্বে, সে ত আমাদের টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়েতে সাহায্য কর্ব্বে না! তবে কেন আমরা আমাদের নিজের ভাল পরিত্যাগ কোর্ব্বো?"

অতুলের কথা শুনিয়া অতুলের পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, "এখনকার ছোলদের সব বাড়াবাড়ি! কা'কেও গ্রাহ্য নেই। আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে চিঠী লিখ্‌তে গেছ্‌লে কেন? বজ্জের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি সমাজ-ঠেকো হয়ে থাক্‌বো না-কি?"

হায় রে, জাত্যাভিমানী অধম বাঙ্গালি! আমাদের মনের এই সঙ্কীর্ণতাই আমাদের এই অধঃপতনের কারণ! স্বদেশীয় স্বজাতিগণের প্রতি পরস্পর আমাদের এত বিদ্বেষ! আমরা আবার দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি বলিয়া চিৎকার করিতে থাকি! আমাদের এই আত্মীয়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একতা স্থাপন করিতে না পারিলে, সহস্র বৎসর ধরিয়া "সমাজ" "সমাজ" বলিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিলেও আমাদের কিছুই হইবে না। দরিদ্রদাহী বরপণের এই তীব্র বিষ সকল সম্প্রদায় মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু কায়স্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দিন দিন এ কুপ্রথা ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে! কত গৃহস্থের ইহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! বঙ্গজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই যদি বিবাহের আদান-প্রদান প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের গৃহে গৃহে এত হাহাকার উঠিত না; সরলা বালিকা অজ্ঞানতা-বশতঃ অকালে আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপ করিয়া মাতাপিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইত না। গৃহে গৃহে কন্যাদায়, গৃহে গৃহে হাহাকার! হতভাগ্য জাতির তথাপি চক্ষুরুন্মীলন হইল না!

অতুলের সহস্র অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও অতুলের পিতা সুধীরের সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতুল আর কি করিতে পারে? পিতার বর্ত্তমানতায় কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার তাহার অধিকার নাই। পিতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। সুতরাং, তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। বিভার বিবাহ হইয়া যাইল। নগদ পাঁচশত টাকা দিয়া বিভার পিতা, বিভার জন্য একটী পাত্র ক্রয় করিলেন। পাত্রীর বয়ঃক্রম ৪৫বৎসর মাত্র; তৃতীয় পক্ষের পাত্র।

সমাজের এই যথেচ্ছ অত্যাচার অতুল নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল। সুধীরও সে বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু বিভার এ বিবাহ দেখিয়া সে সুখী হইতে পারিল না। বালিকার সুন্দরী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া

গিয়াছিল। কিন্তু শুধু যে এইজন্যই সে সুখী হইতে পারিল না, তাহা নহে। দশ বৎসরের পাত্রী আর ৪৫ বৎসরের পাত্র!" এরূপ মিলন তাহার চক্ষে কেমন বিষময় দৃশ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যদিও বিভার সহিত তাহার অল্পদিনের পরিচয়, তথাপি সে বিভাকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। নিজের হৃদয়-পানে চাহিয়া সে দেখিল, সেখানে একখানা গাঢ় কাল অন্ধকারময় মেঘ হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। হায় রে, নিষ্ঠুর [illegible]! তোমার এ কি অত্যাচার!

(৮)

সুধীর যখন বি, এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ, ও ল' পড়িতেছিল ও মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি পাইতেছিল, তখন সুধীরের উপর এক ব্যক্তির লোলুপদৃষ্টি পতিত হইল। ইনি আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। অবিনাশবাবু একজন মহামান্য ব্যবসায়ী লোক। জাপান হইতে শিল্প ও বাণিজ্যের বিষয় শিক্ষা করিয়া তিনি ভারতে কারবার খুলিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। কিন্তু এ-সব গুণ থাকিলে কি হয়!—তাঁহার একটী বড় দোষ ছিল; তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিলেন। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন; পরের মতানুযায়ী চলা বা কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। তিনি সুধীরের সহিত তাঁহার কন্যা লীলার বিবাহ দিবেন, মনস্থ করিলেন। "বাঙ্গাল" বলিয়া গৃহিণী একবার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও, সে আপত্তি টিকিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবিনাশবাবু একজন তেজস্বী ব্যক্তি; কাহারও কথা তিনি গ্রাহ্য করেন না; গৃহিণীরও না! তাই তিনি গৃহিণীর এ আপত্তি শুনিলেন না। তিনি অবজ্ঞা ভরে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, রেখে দাও তোমার বাঙ্গাল্! এমন ছেলে কটা আছে, বল দেখি? দশহাজার টাকা দিলেও এমন ছেলে এখানে মিল্‌বে না! বিদ্বান্ যে রকম; আবার চেহারাখানিও তেমনি সুন্দর! কোথায় এমন পাত্র পাও? লীলার বিয়ের জন্যে আজ এক বৎসর ধরে ছেলে খুঁজ্‌চি,—কোথাও মনের মত বর দেখ্‌তে পেলুম না। এ ছেলে হাতছাড়া কর্‌তে পার্‌বো না। আমি না মেয়ে দিই,—কত লোকে এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়্‌বে।" গৃহিণীর আর সাধ্য হইল না কর্ত্তার কথার উপর কথা কহেন।

অবিনাশবাবু ঘটকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া হরনাথবাবুর ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে আনাইয়া কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা পাকাপাকি করিয়া ফেলিলেন। হরনাথবাবু আনন্দের সহিত পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে ভগবান্, বুঝি, সুধীরের একটা ভাল মুরুব্বি জুটাইয়া দিলেন। হায়! অন্ধ মানব এমনই আশার দাস!

লীলার সুগোল, সুডৌল গঠনখানি, কুঞ্চিত-কৃষ্ণ কেশরাশি, আয়ত চক্ষুদ্বয়, স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সকলই হরনাথবাবুর চক্ষে অতুলনীয় সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে তিনি যেন একটা মাধুর্য্য মাখান দেখিলেন। বুঝি, এমনটী আর নাই।

সুধীর নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া একটু আপত্তি করিয়াছিল। সে স্পষ্টই পিতাকে বলিয়াছিল, "বাবা, আমরা গরিব; বড়লোকের মেয়ে আমাদের ঘরে সাজ্‌বে না। এ বিয়েতে কাজ নেই।" কিন্তু হরনাথবাবু "না" বলিতে পারিলেন না। একে ত, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর লীলার সেই স্নেহমাখা কোমল মুখখানি বৃদ্ধের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লীলাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত বাসনা জন্মিতেছিল।

বিধাতার ভবিতব্যতাই বলুন, আর লীলার কর্ম্মফলই বলুন, শ্রীমান্ সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কলিকাতাতেই উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পরে হরনাথবাবু পুত্র ও পুত্রবধূ স্বগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। অবিনাশবাবু কিন্তু নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বৈবাহিককে নিরস্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "লীলা এখন নেহাৎ ছেলে মানুষ। আপনার ঘরে কেউ নেই; সে কা'র কাছে থাকবে? একটু বড় হোক্, নিয়ে যাবেন। সে ত এখন আপনারই হ'ল; যখন ইচ্ছা নিয়ে যাবেন; তার জন্যে আর কি? এখন যদি সেখানে গিয়ে ওর মন না টেকে—কাঁদাকাটা করে—তা হ'লে একটা অসুখ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর আপনিও তা'হলে বিপদে পড়্‌বেন।"

হরনাথবাবু অধিক পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না; কুণ্ণমনে একাকী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গ্রামের লোকে বধূ দেখিবার জন্য তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে, তিনি তাহাদের অনেক বলিয়া কহিয়া শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের মন তৃপ্ত হইল না। তাঁহার এত আদরের সুধীরের বৌ, তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূ, সে বধূ তাঁহার গৃহে আসিল না; এ কি প্রকার বিবাহ হইল! মুখেও অবিনাশবাবু খুব সৌজন্য দেখাইলেন; ভিতরে কি তাঁহার কিছুই নাই? সকলই কি মুখ-সর্ব্বস্ব? কেবল খোষা-ভূষি সার! সুধীর ত বলিয়াছিল, "বড়লোকের মেয়ে গরিবের ঘরে সাজ্‌বে না।" সত্যই কি শেষে সুধীরের কথা কার্য্যে পরিণত হইবে? কেনই বা তবে তিনি সুধীরের কথা না শুনিয়া বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন? কিন্তু এখন আর সে চিন্তা করা বৃথা! কার্য্যশেষে অনুশোচনায় কোনও লাভ নাই।

(৯)

দেখিতে দেখিতে আরও তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে হরনাথবাবু আরও দুইবার লীলাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এ দুইবারও নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া অবিনাশবাবু লীলাকে পাঠান নাই।

এদিকে সুধীর যখন এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন বঙ্গের অদৃষ্টের লইয়া একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে কত নিরীহ যুবককেও শ্রীঘরবাস করিতে হইয়াছিল! দোষীর সহিত কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল!

সুধীর একে মেসে থাকিয়া এম-এ পড়িতেছিল, তাহাতে সে পূর্ব্ববঙ্গবাসী। সুতরাং, সে যে একজন 'এনার্কিষ্ট'-দলভুক্ত—ইহা পুলিশ-পুঙ্গবের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিতে পতিত হইয়া সুধীর কারারুদ্ধ হইল। তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য অবিনাশবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ সুধীরকে অপরাধী প্রমাণ করিতে সমর্থ হইল না। কিছুদিন কারাবাসের পর সুহৃদয় বিচারপতি সুধীরকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিয়া মুক্তিপ্রদান করিলেন। রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় সুধীর ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। সেবার পরীক্ষায় সে এম-এতে নিম্ন স্থান অধিকার করিল, ও আইনে 'ফেল' হইল। তাহার পর মনের কষ্টে সে পিতার নিকট দেশে চলিয়া গেল।

মানুষের সময় যখন মন্দ হয়, তখন সকল দিক্ হইতেই অশান্তি আসিয়া দেখা দেয়। সুধীর গৃহে আসিয়া দেখিল, পিতা পীড়িত। সেই জীর্ণশীর্ণ, রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণ দেহে তাঁহাকে গৃহের অনেক কার্য্যই স্বহস্তে করিতে হইতেছে। তাহা দেখিয়া সুধীরের বড় কষ্ট হইল। তাহার স্ত্রীর উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। সে বিবাহ করিয়াছে কি জন্য? স্ত্রী দেবতার মত অদৃশ্যে থাকিবে, আর সে সেই স্ত্রীর ধ্যানে জীবনাতিপাত করিবে বলিয়া? না, বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়া? সে ত পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়াই অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিল। স্ত্রী যদি তাহা না করিল, তবে সেরূপ স্ত্রীতে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। হউক্ না, সে ধনাঢ্যের কন্যা। দরিদ্রের পুত্রবধূ—দরিদ্রের স্ত্রী ত সে বটে? কেন সে তবে তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে না? সুধীর মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি তাই শিখেছি। ঘরের কাজ কর্ত্তে কখনো শেখান নি, আমিও তা শিখি নি যে, আপনার একবিন্দু সাহায্য করি। কিন্তু আপনি যে এ বয়েসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে আমাকে খাওয়াবেন, তা আর আমি সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বো না। আর এখন আমার চাকরিও কিছু হয় নি যে, একজন রাঁধুনি রাখ্তে পারি। আপনি এক কাজ করুন,—একবার কলিকাতায় গিয়ে ওদের নিয়ে আসুন।"

হরনাথবাবুরও কি সেই ইচ্ছা নহে যে, পুত্রবধূটী আসিয়া তাঁহার এ নির্জ্জন গৃহখানি জনপূর্ণ করিয়া তোলে? তাঁহার কি ইচ্ছা হয় না যে, তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রবধূ একমুষ্টি ভাত রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়ায়? কিন্তু কি করিবেন! সে সুখ তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তিনি না বুঝিয়া এক কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিধিলিপি অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরনাথবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না, বাবা, যেহাই বউমাকে পাঠাবেন না! মিছে আন্তে যাব। সে আসবে না। সে বড়লোকের মেয়ে।" সুধীর মনে মনে বলিল, সে কথা আমি আগেই বলেছিলাম—তখন শুনলেন না! কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা বলিয়া পিতার মনে কষ্ট দেওয়া সে যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। তাই সে বলিল, "কেন আসবে না? হোক্ সে বড় লোকের মেয়ে। গরিবের বউ ত হয়েছে?

আর এখন সে নিতান্ত ছেলেমানুষটিও নেই যে কাঁদাকাটার ওজর দেখাবে। আপনি একবার যান্ দেখেই আসুন না কেন, কি বলেন। এবার যদি না পাঠান, তা হলে যা'হোক্ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়্ব না। চিরকাল বাপের অট্টালিকায় বসে সুখভোগ কর্ব্বে, এমন কোনো লেখাপড়া করে ত আপ্নি আমায় বিয়ে দেন নি!"

হরনাথবাবু বুঝিলেন, সুধীরের একান্ত ইচ্ছা বধূটীকে লইয়া আসা। তাই তিনি আর কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বধূ আনিতে কলিকাতায় গেলেন। অবিনাশবাবু কিন্তু কন্যা পাঠাইতে এবারেও অসম্মতি জানাইলেন। অধিকন্তু বৈবাহিককে বেশ "মিঠে-কড়া" রকম দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। হরনাথবাবু আর কোনও কথা না বলিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন।

সুধীর একে পূর্ব্ব হইতেই পত্নী ও শ্বশুরের উপর চটিয়াছিল; এবার তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে মনে মনে একটা দৃঢ়সংকল্প করিয়া স্ত্রীকে আনিতে স্বয়ং যাত্রা করিল। তারপর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

আকাঙ্ক্ষা।

সকলি দিয়াছ প্রভু,
আর কিছু নাহি বাকি;
তবুও ভিখারী হয়ে
ও-চরণে আশা রাখি!
সঙ্কল্প বিকল্প শত
পলে পলে রহে জাগি;
পথহারা হয় ভ্রমে;—
চিত্ত দীন কা'র লাগি!
আশার আলোক ফুটে;
নিরাশা নিভায় বাতি।
চেয়ে থাকি কা'র পানে!—
কবে পোহাইবে রাতি!
আসক্তি কঠিন পাশ,
ছিঁড়িবে কাহার বলে?
মান অভিমান সব,
ভেসে যাবে কোন্ জলে?
সুখে দুখে নির্ব্বিকার
কর এই চিত্তভূমী,
বাঞ্ছিতের এ আকাঙ্ক্ষা
পূরাও জগৎ-স্বামী!

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সংবাদ-সংগ্রহ।

১। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।—শ্রীমতী সরলা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের পঞ্জাবশাখার সেক্রেটারী। তিনি পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা হইতে প্রতিনিধিও ভারত-সচিবের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতে চাহেন:—(১) পঞ্জাবের নারীদের বিশেষ প্রয়োজন।

(২) পঞ্জাবে যে-সকল নারী বর্ত্তমান সমরে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা।

(৩) বিধবার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়া অভাবগ্রস্ত বিধবাদের জন্য আশ্রম-স্থাপন এবং প্রত্যেক বিধবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা।

(৪) হিন্দুবিধবাদের স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিধির প্রণয়ন।

(৫) ভারতের বিবাহিতা নারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক যে, বিবাহিত ভারতীয় পুরুষ কোন ইংরাজনারীকে বিবাহ করিলে, তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে।

(৬) ভারত-নারী আইন বা অন্য যে কোনও ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৭) মিউনিসিপাল বা অনুরূপ সকল নির্ব্বাচনে ভারতনারী অধিকার পাইবেন।

(৮) স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে যত অনুষ্ঠান আন্দোলন আছে, ঐ সকলের মধ্যে ভারত-নারীদিগকে গ্রহণ করা হউক্।

(৯) ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা গঠিত কমিটিকে বালিকাবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হউক্।

(১০) বিদেশের মহিলাদের স্থলে ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা পরিদর্শন-এজেন্সী গঠিত হউক।

(১১) স্ত্রীশিক্ষার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে উপদেশ দিবার জন্য মহিলা 'এডভাইসরী বোর্ড' গঠিত হউক।

(১২) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মত ঐ মহিলাবোর্ডকে পদগৌরব অর্পণের ব্যবস্থা করা হউক।

২। মহিলা প্রতিনিধি—ভারতের মহিলা প্রতিনিধিগণের ১৮ই ডিসেম্বর মান্দ্রাজ নগরে ভারত-সচিবের সহিত দেখা করিবার কথা। এলাহাবাদ হইতে শ্রীমতী শ্যামলা নেহরু, শ্রীমতী মোহানি ও মিঃ মহম্মদ আলির জননী প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বাধ্যতামূলক বালিকা-শিক্ষা।—মহীশূর গবর্ণমেণ্ট মহীশূরে বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার-কল্পে বহু সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সংপ্রতি এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মহীশূর ও বাঙ্গালোর এই দুই নগরের ৭ হইতে ১০ বৎসরের বালিকাদের উপরে ১৯১৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা আইন বলবৎ হইবে।

৪। ইংরেজ মহিলাদের বাঙ্গালা ও উর্দ্দু পরীক্ষা।—গেজেটেড অফিসারদের স্ত্রী ও নিকট আত্মীয়দিগকে দেশী ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত বাঙ্গলা ও উর্দ্দুর পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থিনীদের ১০ টাকা ফি দিতে হইবে। উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হইবে ও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে; কিন্তু তাঁহারা অন্য কোনও পুরস্কার পাইবেন না।

৫। ব্রিটিশ নারীদের কর্ম্ম-শক্তি।—ব্রিটনে এখন ৩৭½ লক্ষ নারী যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইহাদের মধ্যে ১২½ লক্ষের অধিক সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ৬ লক্ষ ৭০ হাজার নারী গোলাগুলি নির্ম্মাণ করেন। যুদ্ধারম্ভের পরে কার্য্যক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা ১০ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে।

৬। নৌ-সৈন্য-বিভাগে নারী।—ইংলণ্ডের

নৌ-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের ডাক্‌ঘরবিভাগে নৌ বিভাগীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা নাবীর দ্বারা একটি দল গঠন করিয়াছেন।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন পদ।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি নূতন পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার কার্য্য, পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধান। গত মেট্রিকুলেশন, আই-এ ও বি,এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি হওয়াতে এই পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

রেজেষ্ট্রারী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার জেনারলের পার্সোনেল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। সৎকার্য্যে দান।—বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন হোমের কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, শ্রীমতী হরিমতি দাসী তাঁহার স্বামী কলিকাতা-নিবাসী বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্তের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫০৲ টাকা এবং ঐ গৃহে একটি রোগী রাখিবার আংশিক ব্যয় বাবদে ১৭০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-সমালোচনা।

ওঁ পিতা নোঽসি—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত। কলিকাতা ৬১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, (পূর্ব্বদ্বার) হইতে শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ১১শ-স্থানীয়। ইহার মূল্য ।০ মাত্র।

গ্রন্থখানি বৈদিকযুগের "ওঁ পিতা নোঽসি"—(তুমি আমাদিগের পিতা)—এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। আদিকাল হইতে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চের স্বাভাবিক অনভিব্যক্ত পিতৃভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ যে-ভাবকে সর্ব্বাগ্রে "পিতা নোঽসি"—তুমি আমাদিগের পিতা—এইবাক্যে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বরকে সেই পিতৃভাবে আহ্বান করিবার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে অতিসুন্দররূপে প্রাঞ্জলময়ী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ঈশ্বর স্রষ্টা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জগৎপাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জ্ঞানদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহার মঙ্গলময় প্রলয়ে তাঁহাকে রুদ্ররূপে দর্শন করিলেও, ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা বলিয়াও আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ বলিয়া আমাদিগের পিতা এবং ঈশ্বর শুভদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা, ঈশ্বরের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতিও গ্রন্থে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভগবানের সৃষ্টি-, স্থিতি- ও প্রলয়-বিধানে, সর্ব্বত্র বিচিত্র সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া ও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ পিতৃরূপে অবলোকন করিয়া, অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার সান্নিধ্যোপলব্ধিজনিত আনন্দ লাভ হয়, তাঁহাতে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এবং ঈশ্বরোপাসনার যথেষ্ট সহায়তা হয়। ঈশ্বরোপাসক, ধর্ম্মার্থী, সকল নরনারীর ইহা প্রভূত উপকার সাধন করিবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মপরিবারে ইহা পঠিত হউক, ও সকলের নিকট আদৃত হউক।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
[illegible] কর্ত্তৃক [illegible] হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 653 January, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৩ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২৪। জানুয়ারি, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র—কাওয়ালী।

জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ;
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস্ মাগে,
গাহে তব জয় গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্য বিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয়, জয়, জয়, জয় হে!
অহরহঃ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী;
হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খৃষ্টানী;
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চির-সারথি! তব রথ-চক্রে,
মুখরিত পথ দিন-রাত্রি।

ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে,
পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল,
নত নয়নে অনিমেষে।
রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি,
পূর্ব্ব উদয়-গিরি-ভালে ;
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য-সমীরণ
নব-জীবন-রস ঢালে।
পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা ;
দারুণ বিপ্লব-মাঝে, তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সংকট-দুঃখ-ত্রাতা।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে, রক্ষা করিলে অঙ্কে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
তব করুণারুণ রাগে, নিদ্রিত ভারত জাগে,
তব চরণে নত মাথা !
জন-গণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জন-গণ-পথ-পরিচায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জন-গণ-দুঃখ-ত্রায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর,
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !
জয় হে জয় হে জয় হে
জয় জয় জয় জয় হে ॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২ ৩ ০ ১
॥ সা রা গা গা । গা গা গা গা । গা -া গা গা । রা গা মা -া ॥
জ ন গ ণ ম ন অ ধি না • য় ক অ য় হে •

২ ৩ ০ ১
। গা -া গা গা । রা -গা রা রা । না -রা সা -া । -া -া সা -া ।
ভা • র ত ভা • গ্য বি ধা • তা • • • পা •

২ ৩ ০ ১
। পা -া পা পা । -া পা পা -া । পা -া পা পা । পা ঋা ধা পা ।
জা • ব সি • ন্ধু গু জ্ রা • ট মা রা • ঠা •

২ ৩ ০ ১
। মা -া মা মা । গা -া গা মা । রা -মা গা -া । -া -া -া -া ।
দ্রা • বি ড় উ ৎ ক ল ব • ঙ্গ • • • • •

২ ৩ ০ ১
। গা -া গা গা । গা -মা রা রা । গা পা পা -া । মা -া মা -া ।
বি • ন্ধ্য হি মা • চ ল য় মু না • গ • ঙ্গা •

২ ৩ ০ ১
। গা -া গা গা । রা রা রা রা । না -রা সা -া । -া -া -া -া ।
উ • চ্ছ ল জ ল ধি ত র • ঙ্গ • • • • •

২ ৩ ০ ১
। সা সা সা সা । সা -া সা -া । না -সা রা -া । -া -া -া -া ।
ত ব শু ভ না • মে • জা • গে • • • • •

২ ৩ ০ ১
। রা রা রা রা । রা -া রা রা । সা -রা গা -া । -া -া -া -া ।
ত ব শু ভ আ • শি স্ মা • গে • • • • •

২ ৩ ০ ১
। গা -া গা গা । রা -গা রা রা । না -রা সা -া । -া -া -া -া ।
গা • হে ত ব • জ য় গা • থা • • • • •

২ ৩ ০ ১
I পা পা পা পা। পা -া পা পা। পা -া পা পা। ক্ষা ধা পা -া I
জ ন গ ণ ম ০ ঙ ল দা ০ য় ক জ য় হে ০

২ ৩ ০ ১
I মা -া মা মা। গা -া রা রা। না -রা সা -া। -া -া -া -া I
তা ০ র ত ভা ০ গ্য বি ধা ০ তা ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I না না র্সা -া। না ধা না -া। -া -া পা পা। ধা -া -া -া I
জ য় হে ০ জ য় হে ০ ০ ০ জ য় হে ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I সা সা রা রা। গা গা রা গা। মা -া -া -া। -া -া -া -া II
জ য় জ য় জ য় জ য় হে ০ ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
II সা সা সা সা। সা সা সা -া। না রা রা রা। রা -া রা রা I
(১) অ হ র হঃ ত ব আ ০ হ্মা ০ ন প্র চা ০ রি ত
(২) প ত ন অ ০ ভ্যু দ য় ব ০ ন্ধু র প ০ ন্থা ০
(৩) যো ০ র তি মি র ঘ ন নি বি ড় নি শী ০ থে ০
(৪) রা ০ ত্রি প্র ভা ০ তি ল উ দি ল র বি ০ চ্ছ বি

২ ৩ ০ ১
I সা রা গা গা। গা গা -া গা। -রা -গা মা -া। -া -া -া -া I
(১) শু নি ত ব উ দা ০ র বা ০ ণী ০ ০ ০ ০ ০
(২) যু গ যু গ ধা ০ বি ত যা ০ ত্রী ০ ০ ০ ০ ০
(৩) পী ০ ড়ি ত মু ০ চ্ছি ত দে ০ শে ০ ০ ০ ০ ০
(৪) সু ০ র্ব্ব উ দ য় গি রি ভা ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I মা ০ পা পা পা। -া পা পা পা। পা -মা ধা পা। -া ক্ষা ধা পা I
(১) হি ০ ম্ বো ০ ল্ধ খি থ জৈ ০ ন পা ০ র সি ক
(২) হে ০ চি র সা ০ র থি ত ব র থ চ ০ ক্রে ০
(৩) আ ০ গ্র ত ছি ল ত ব অ বি চ ল ম ০ ঙ্গ ল
(৪) গা ০ হে বি হ ০ ঙ্গ ম পু ০ ণ্য স মী ০ র ণ